॥ প্রাইজ ও লাইব্রেরীর উপযোগী অভিনব গ্রন্থ ॥

দাদা হর্ষবর্ধন ভাই গোবর্ধন

[কিশোরদের অফুরন্ত হাসির গল্প]

॥ শিবরাম চক্রবর্তী ॥

সিটি বুক এজেন্সী
প্রকাশক ও পরিবেশক
৪৪/১সি, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

দ্বিতীয় প্রকাশ
১৯৬৪

● প্রকাশক
পি, দে
৪৪/১সি, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯।

● মুদ্রক
শ্রীঅবনীমোহন রায়
তারকনাথ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১২, বিনোদ সাহা লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬।

● পুস্তক বাঁধাই
সিটি বাইণ্ডার্স
৪৪/১এ, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯।

● প্রচ্ছদপট
রঞ্জিত দাস

॥ উৎসর্গ ॥

দাদা সন্দীপন

আর দিদি দীতায়া-কে

দাদু শিব্রাম

-- এই লেখকের আরো বই—

গরু ছিল ঋষি

ফাঁকির জন্য ফিকির খোঁজা

হাতীর সঙ্গে হাতাহাতি

টাক হলেই টাকা হয়

যত খুশি হাসো

প্রাণকেষ্ট ও ধিনিকেষ্ট

বক্কেশ্বরের লক্ষ্যভেদ

চুরি গেলেন হর্ষবর্ধন

যুদ্ধে গেলেন হর্ষবর্ধন

চেঞ্জে গেলেন হর্ষবর্ধন

বিগড়ে গেলেন হর্ষবর্ধন

কীর্তিমান হর্ষবর্ধন

হর্ষবর্ধনের হর্ষধ্বনি

কথায় কথায় ফ্যাসাদ

॥ দোকানে গেলেন হর্ষবর্ধন ॥

বাসে উঠেই হর্ষবর্ধন ভাবিত হন। ভাইকে ডেকে বলেন —"সনাতন খুড়ো বলেছিলো সাহেবী দোকানে পাওয়া যায় জিনিসটা। কিন্তু সাহেবী দোকান যে কোথায় কে জানে!"

"খুড়োর আর কি, বলেই খালাস।" গোবর্ধন গজরায়,— "এখন আমরা ঘুরে মরি সারা কলকাতা।"

হর্ষবর্ধন মুখভঙ্গী করেন—"কাকেই বা জিগ্‌গেস্ করি—কেই বা জানে!"

ওরা ছাড়া আরো একটি আরোহী ছিল বাসে, তিনি মহিলা। গোবর্ধন সেই দিকে দাদার দৃষ্টি আকর্ষণ করে—"ওকে জিজ্ঞাসা করলে হয় না? মেয়েদের অজানা কী আছে?"

প্রস্তাবটা হৃদয়গ্রাহী হয় হর্ষবর্ধনের। এ দুনিয়ার সব কিছুই মেয়েদের নখদর্পণে, সে কথা সত্য। "তুই জিজ্ঞাসা কর।"

"তুমিই কর দাদা।" গোবর্ধনের সাহসের অভাব।

"কী ভীতু রে!" তিনি ফিস্‌ফিস্ করেন—"কর না তুই, গোব্‌রা! ভয় কিরে? আমি তো তোর কাছেই আছি!"

"উঁহু। গোবর্ধন ঘাড় নাড়ে।

অগত্যা হর্ষবর্ধনকেই মরিয়া হতে হয়। অনেকবার হাত কচ্‌লে অবশেষে তিনি বলেই ফেলেন—"দেখুন, আমরা একটা মুস্কিলে পড়েছি,"—সমস্যাটা তিনি প্রকাশ করেন মহিলাটির কাছে।

মহিলাটি জবাব দেন "আপনারা হল্ য়্যাণ্ডারসনের দোকানে যান না কেন? আর কিছুদূর গেলেই ত—!"

এই বলে' তিনি বাসের কনডাক্‌টারকে ওদের যথাস্থানে নামিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়ে নেমে যান এলগিন্ রোডের মোড়টায়।

পাঞ্জাবী কনডাক্‌টার চৌরঙ্গীতে এক সাহেবী দোকানের সামনে ওদের নামিয়ে দেয়—"হলন্দর-সন্‌কো মুকান এহি হ্যায় বাবুজি!"

তারপর হর্ণ বাজিয়ে চলে যায় বাস।

বাড়িটার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে' হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়েন,—"হ্যাঁ, এই দোকানটাই বটে কি বলিস গোব্‌রা?"

"ঠিক। সনাতনখুড়ো যেমনটা বলেছিল তার সঙ্গে মিলছে হুবহুব্।" গোবর্ধন ঘাড় নাড়তে কার্পণ্য করে না।

"পড়্‌তো পড়ে দ্যাখ্‌তো, কি লিখেছে বড় বড় ইংরেজীতে!"

গোবর্ধন বানান করে করে পড়ে মনে মনে। তারপর বলে —"বুঝেছ দাদা, এরা হচ্ছে সব হল্যাণ্ডের হল্যাণ্ড্ বলে একটা দেশ আছে জানো তো? ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, ইস্‌কট্‌ল্যাণ্ড্—"

"যা যাঃ! তোকে আর ভুগোল ফলাতে হবে না! ভারি তো বিদ্যে! তার আবার ইস্‌কট্‌ল্যাণ্ড্!" হর্ষবর্ধন ধম্‌কে দ্যান। "কি পড়লি তাই বল।"

"ঐ কথাই। হল্যাণ্ড আর তার ছেলেপুলে।"—গোবর্ধন ব্যাখ্যা করতে চায়।—"ঐ তো পষ্টই লিখে দিয়েছে পড়েই দ্যাখো

না? হল্যাণ্ড্—য়্যাণ্ড্—য়্যাণ্ড্ মানে তো এবং? য়্যাণ্ড্ হার্—হার্ মানে তো তার? হিজ্—হার্—মনে নেই তোমার? য়্যাণ্ড্ হার্ সন্—এবং তার ছেলেপুলে।"

হর্ষবর্ধনের চোখ এবার স্বভাবতই কপালে ওঠে। য়্যাঁ? এত বড় কথা লিখে দিয়েছে! কলকাতায় এসে কারবার করছে কি না স্বয়ং হল্যাণ্ড? সঙ্গে আবার তার ছেলেপুলে নিয়ে? অবাক্ কাণ্ড!

হর্ষবর্ধনকে চোখ খাটাতে হয়, বাধ্য হয়েই। যদিও একটু খাটালেই তাঁর চোখ টাটায়—চল্লিশের পর থেকেই এম্নি। যাই হোক, বদন-ব্যাদন করে, আকর্ণ চক্ষু-বিস্তার করার চেষ্টা পান তিনি।

নাঃ, অতটা ভয়াবহ কিছু নয়। ক্রমশঃ তাঁর হাঁ বুজে আসে—চোখও সংক্ষিপ্ত হয়।

"হার্ কই? হার্?" উষ্ণ হয়ে ওঠেন তিনি। "এইচ্ গেল কোথায়? হার্ সনের এইচ্—শুনি তো একবার?" গোব্রাকে তাঁর প্রহার করার ইচ্ছা হয়।

"পড়ে গেছে।" গোবর্ধন আম্তা আম্তা করে। "পড়ে যায় না কি?"

"তোর মাথা! পড়ে গেলেই হোলো! তক্ষুনি তুলে ধরে আবার লাগিয়ে দিত না তাহলে?" হর্ষবর্ধন গোঁফে চাড়া দেন—"ও কথাই নয়! কথাটা হচ্ছে···হুম্!"

দাদার আবিষ্কার অবগত হবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয় গোবর্ধন।

"কথাটা হচ্ছে আর কিছু না। হলধর আর ইন্দ্রসেন—বুঝলি?" বলে, গোঁফের ডগায় তিন ডবল হস্তক্ষেপ করেন তিনি

গোবর্ধন অবাক হয়ে যায়—"অতবড় লম্বাচোড়া কথাটা হয়ে গেল হলধর আর ইন্দ্রসেন!"

"হবে না কেন?" হর্ষবর্ধন বলেন, "ইংরাজীতে বানান করতে গেলে তাইতো হবে। কলকাতা কেন ক্যাল্কাটা হয় তবে? ব্রহ্মদেশ কেন বার্মা হয় শুনি? গঙ্গা গ্যাঞ্জেস? ইংরাজীতে

আমার নাম বানান করে' ছাখ না, তাহলেই টের পাবি। করে ছাখ্।"

সে ছুশ্চেষ্টা গোবর্ধন করে না—ছুঃসাধ্য কাজে স্বভাবতই সে পরাঙ্মুখ এবং পরমুখাপেক্ষী।

অগত্যা হর্ষবর্ধনই প্রয়াস পান—"আমার নামের বানান নেহাৎ সোজা নয় রে! অনেক মাথা ঘামিয়ে তবে বের করেছি। প্রথমে ধর্, এইচ্—ও—আর—এস্—ই,—কী হোলো? হর্স্। তারপরে হবে বি—আই—আর্—ডি,—কী হোলো? বার্ড। তারপর গিয়ে ও—এন—অন…তার ওপরে। হর্স্-বার্ড্-অন! হুম্"

গোবর্ধনের বিস্ময় ধরে না। দাদার বেশ প্রতিভা আছে, বাস্তবিক।

"মানেও বদ্লে গেল কত না!" নিজের অর্থ নিজেকেই তাঁর খোলসা করতে হয় আবার। "কোথায় আমি হর্ষবর্ধন, না কোথায় আমি ঘোড়ার ওপরে পাখী! কিংবা পাখীর ওপরে ঘোড়া! ও একই কথা!

মানেটা মনঃপুত হয় না গোব্রার। ঘোড়ার সঙ্গে তার দাদার তুলনা—ছ্যা! দাদাকে ইতর প্রাণীর আসন দান করতে স্বভাবতই তার কুণ্ঠা হয়।

সে বিরক্তি প্রকাশ করে—"কিন্তু যাই বল দাদা! ইংরেজী করলে নামের আর কোন পদার্থ থাকে না। হর্ষ কথাটার বাংলা মানে হোলো আনন্দ, আর ইংরেজী মানে কি না ঘোড়া! ঘোড়ায় আর আনন্দে কত তফাৎ! ভাবো তো এক্বার!"

গোবর্ধন একটা হাত আকাশে আর একটা হাত পাতালে পাঠিয়ে যেন ব্যবধানটাকে পরিস্ফুট করতে চায়!

"কিচ্ছু তফাৎ নেই! ঘোড়ার পিঠে চেপেছিস্ কখনো? চাপলেই বুঝবি।" হর্ষবর্ধনের হর্ষধ্বনি হয়—"ঘোড়া আর আনন্দ এক।"

"হ্যাঁ, যদি পড়ে না যাও তবেই!" গোবর্ধন নিজের গোঁ ছাড়ে না।

"তোর যেমন কথা! আমি বুঝি পড়ে যাই কখনো? দেখেছে কেউ? তা আর বল্‌তে হয় না!" ঘোড়ার সঙ্গে নিরানন্দের কোনো ঘনিষ্ঠতা তাঁর জীবনে কখনো হয়েছিল কি না হর্ষবর্ধন সে কথা ভুলে থাকতেই চান। "কিন্তু আমার ছবিটা কেমন হয় বল্ দেখি? একটা ঘোড়া তার পিঠের ওপর একটা পাখী! কিংবা একটা পাখী তার পিঠে একটা ঘোড়া—সে যাই হোক্! কেমন, খাসা হয় না? চ···মৎকার!

নিজের ছবির কল্পনায় নিজেই যেন তিনি মুহ্যমান্ হয়ে পড়েন।

গোবর্ধন তবু গোমড়া হয়ে থাকে—"এর চেয়ে তোমার সেই ছবিই ছিল ভালো।"

"কোন্ ছবি?"

"সেই যে সেদিন একটা লোক মইয়ে উঠে আমাদের বাড়ির দেওয়ালে সাঁটছিল—?

"সেই কোন্ রাজা মহারাজার ছবি?" ভ্রূকুঞ্চিত করে, বিস্মৃতির পংকোদ্ধার করেন হর্ষবর্ধন। "নারে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই কিং কং না কী যেন!" গোবর্ধন সায় দ্যায়।

"এবার মনে পড়েছে।" হর্ষবর্ধন বলেন—"ওঃ! আমার সেই আরেক প্রতিমূর্তি—! যা দেওয়াল থেকে খুলে বাঁধিয়ে দেশে নিয়ে গিয়ে তোর বৌদিকে উপহার দেব বলেছিলুম না? সে-ছবি তো, হ্যাঁ, সে তো খুব ভালোই,—"। হর্ষবর্ধন বাক্যটাকে সজোরে শেষ করেন—"কিন্তু আমার এ-ছবিটাই বা এমন মন্দ কি।"

"কি জানি!" গোবরা ঘাড় নাড়ে। "তোমার এই চারপেয়ে ছবি বৌদির পছন্দ হ'ল হয়!"

হর্ষবর্ধন খাপ্পা হয়ে ওঠেন—"হ্যাঃ, তাই নিয়েই আমি মাথা

ঘামাচ্ছি কি না! তোর বৌদির মনের মত হবার জন্যে হাত-পা সব আমার একে একে ছেঁটে ফেলতে হবে আর কি।"

ঘোড়ার কথা ছেড়ে গোড়ার কথায় ফিরে আসে গোবর্ধন। "তা ইন্দ্রসেন না হয় হোলো। কিন্তু 'ধর' কই? 'ধর'? হলধরের 'ধর'?"

"চল্ চল্, আর বকতে হবে না তোকে। কেন, 'হল্' তো ঐ রয়েছে। মাথা থাকলেই হোলো, 'ধড়' নিয়ে কি হবে?" বলে তিনি অনুযোগ করেন আবার: "মাথা থাকলেই ধড় থাকে। অনেক সময় উহ্য থাকে—এই যা।"

হর্ষবর্ধনের পদক্ষেপ শুরু হয়। গোবর্ধন আর বাক্যব্যয় করে না।

দোকানের ভেতর ঢুকতেই এক"বাঙালী কর্মচারী এগিয়ে আসে—"কি চাই আপনার?"

"আমার কিছু চাই না।" হর্ষবর্ধন বলেন। "আমাদের দেশের সনাতনখুড়ো—তারই একটা জিনিস চাই, তার জন্যেই কিনতে আসা আমাদের।"

"কী জিনিস বলুন।"

"আপনাদের এই হলধরের দোকান থেকে অনেকদিন আগে একটা মাখন তোলার কল কিনে নিয়ে গেছলেন আমাদের সনাতনখুড়ো। সেই কলের, মশাই, একটা খুরি গেছে হারিয়ে। সেই কলেই লাগানো থাকত সেই খুরি—সেই খুরিটা চাই।" গোবরা সায় দেয় দাদার কথায়।

"মাখন-কলের খুরি? কি রকম সেটা, বুঝিয়ে দিন তো মশাই।"

"আমি কি আর দেখতে গেছি? হারিয়ে গেল তার আর দেখলাম কখন।"

গোবর্ধন যোগ ছায়—"কি রকম আর? এই খুরি যেমন ধারা।

একটু পরেই ওদের বাক্‌বিতণ্ডা শুরু হয়।

বাক্‌বিতণ্ডা দেখে এক সাহেব সেল্‌স্‌ম্যান্‌ এসে দাঁড়ায়—"হোয়াট বাবু ?"

বহুদিন থেকেই হর্ষবর্ধনের মনের বাসনা নিজের ইংরেজী বিদ্যার বহর কোথাও জাহির করেন,—এমন অযাচিতভাবেই সেই আকস্মিক যোগ যেন আবির্ভূত হয় এখন তাঁর জীবনে।

তিনি আর কালবিলম্ব করেন না—"ইয়েস্‌ সার্‌। ইয়েস্‌—উই ওয়ান্ট্‌—উই ওয়ান্ট্‌ এ খুরি—"

"খুরি—হোয়াট ?"

"ইয়েস, খুরি। খুরি সার !"

"খুরি ? দি স্পেল ?" সাহেব জিজ্ঞেস করে।

"হোয়াট সার ?" হর্ষবর্ধনের বোধগম্যতার বাইরে পড়ে প্রশ্নটা।

"বানান করতে বলছেন সাহেব।" বাঙালী বাবুটি বুঝিয়ে দেয়।

"ও ! বানান ? খুরি—খ-য়ে হ্রস্‌-উ—"

"উহু-হু !" গোবর্ধন বাধা দেয়—"ইংরেজী বানান। বাংলা কি বুঝবে সাহেব ?"

"ও ! ইংরেজী ? খুরি—কে-এচ্‌-ইউ-আর-আই—।"

আই—তুমি ঠিক জানো ? ওয়াই-ও তো হতে পারে।" গোবর্ধন ফিস্‌ফিসায় কানের কাছে।

"পাগল। ওয়াই হয় কখনো ? বি-এল্‌-এ ব্লে, বি-এল্‌-ই ব্লি, বি-এল্‌-আই ব্লাই। তারপরে বি-এল্‌-ও ব্লো, বি-এল্‌-ইউ ব্লিউ আর—বি-এল্‌-ওয়াই ব্লোয়াই।"

"তাহলে খুরি করতে তুমি খুরাই করেছ যে।"

"তাই নাকি ? তাইত !" হর্ষবর্ধন আকাশ থেকে পড়েন। "নো সার্‌ নট্‌ 'আই'—" তিনি তৎক্ষণাৎ ভ্রমসংশোধন যোগ করেন——"বাট্‌ ই'—ওন্‌লি 'ই' সার্‌"

বানানটা মনে মনে নাড়াচাড়া করে বাঙালী কর্মচারীটিকে উদ্দেশ্য করে সাহেব বলে—"ব্রিং মি দি চেম্বারস্‌, বাবু !"

চেম্বারস্ আনীত হলে সাহেব পটাপট পাতা উল্‌টে যায়। ক্রমশঃ সাহেবের কপালে রেখা পড়ে, ভুরু কুঁচ্‌কায়, নাক সিঁটকায়—সারা মুখ বিকৃত হয় কিন্তু খুরির কোন পাত্তা পাওয়া যায় না কোথাও; ছত্রে ছত্রে পত্রে পত্রে অনেক ঘোরাঘুরি করেও খুরির কিন্তু খোঁজ পাওয়া যায় না কোনো।

গোবর্ধন মন্তব্য করে—"বাবাঃ! কী মোটা বই একখান! বোধ হয় ইংরেজী মহাভারত!"

"ড্যাম্ ইওর্ খুরি" সাহেব ঝাঁঝিয়ে ওঠে,—ব্রিং অক্সফোর্ড!"

ইতিমধ্যে এক মেম সেল্‌স্‌ম্যান এসে কি এক জরুরী কথা বলে, সাহেব তার সঙ্গে ডিপার্টমেণ্টের অন্যধারে চলে যায়। বেয়ারাকে হাঁক দিয়ে যায়—"চেম্বার্স্ লে যাও"

"বাবা কী আওয়াজ!" গোবর্ধনের পিলে চমকায়!

"হবে না কেন? গোরু খায় যে। গোরুর আওয়াজটা কি কম নাকি? হাম্—"

গো-ডাকের গোড়াতেই দাদার মুখ চেপে ধরে গোবর্ধন। "করচ' কি দাদা! ধরে নিয়ে যাবে যে।"

"হুঁঃ! নিয়ে গেলেই হলো!" হর্ষবর্ধন বুক ফোলান। "মাইরি আর কি! আমি কি কচি খোকা?"

"ভুল করে গোরু মনে করে ধরতে পারে তো? তখন কেটেকুটে খেয়ে ফেলতে কতক্ষণ?"

বেয়ারা এসে ওদের ডাকে—"চলিয়ে বাবু। চেম্বার্‌মে চলিয়ে।"

সাদর অভ্যর্থনায় হর্ষবর্ধন আপ্যায়িত হয়ে এগিয়ে চলেন।

যেতে যেতে গোবর্ধন কিন্তু কানাঘুষা করে—আশংকা অব্যক্ত রাখা অসম্ভব হয় ওর পক্ষে—"আমাদের সেই অভিধানের মধ্যে নিয়ে ঢুকিয়ে দেবে নাকি দাদা?"

"হ্যাঁঃ! ঢোকালেই হোলো!" হর্ষবর্ধন ভড়্‌কাবার ছেলে নন—"কেমন করে ঢোকায় দেখাই যাক্ না একবার! এত বড় লম্বা চৌড়া

মানুষটাকে চেম্বারের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে—অত সোজা না। আমরা কি জলছবি নাকি ?—যে লাগিয়ে দিলেই অভিধানের গায়ে সেঁটে যাব অমনি ?"

ভাইকে অভয় দেবার জন্যে গট্‌মট্ করে চলতে চলতেই তাঁকে বুকের ছাতি ফোলাতে হয় অতি কষ্টে।

ওঁদের দুজনকে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দ্যায় বেয়ারা। —"আভি বড়া সাব্ চেম্বারমে বাৎ করতেঁহে—আপ্‌লোগ্ হিঁয়া বৈঠিয়ে।. কল্ হোনে সে হাম তুরন্ত্ লে যায়েঙ্গে।"

"কলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে পিষে ফেলবে না তো দাদা।" গোবর্ধন আবার মুষড়ে পড়ে।

"হ্যাঁঃ পিষ্‌লেই হোলো।" অনুচ্চকণ্ঠে যতটা সম্ভব পরাক্রম প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু কলের কথায় উনিও যে বেশ বিকল হয়ে এসেছেন ওঁর ভাবান্তর থেকে বুঝতে সেটা দেরি হয় না।

"হ্যাঁঃ, পিষ্‌লেই হোলো! আমরা ঢুকতে যাব কেন কলে? আমরা কি ইঁদুর? ইঁদুররাই কেবল বোকার মত ঢোকে কলের মধ্যে।"

মুখে সাপট্ দেন বটে, কিন্তু বেয়ারার ভাবভঙ্গি ক্রমশঃই যেন ওঁর কেমন কেমন ঠেকে। গোবর্ধনের কাপৌরুষ ওঁর মধ্যেও সংক্রামিত হতে থাকে। সনাতন খুড়োর খুরির খোঁজ করতে না এলেই যেন ভালো হতো কেবলি ওঁর মনে হয়। মনে মনে সনাতনের মুণ্ডপাত করেন ওঁরা।

এমন সময়ে সেই মেমটি বড় সাহেবের খাসকাম্‌রা থেকে বেরিয়ে এসে শুধায়ঃ "হোয়াট্ আর ইউ ডুইং হিয়ার বাবু?"

হর্ষবর্ধন তটস্থ হয়ে ওঠে,—"ইয়েস্ সার্।"

"ডোণ্ট্ সার মি! সে—ম্যাডাম্।"

"ইয়েস্ সার্।" পুনরুক্তির কোথায় ত্রুটি ঘটেছে হর্ষবর্ধন তা বুঝতে পারে না—ভারি বিব্রত হয়। মেমটা এবার দাব্‌ড়ি দ্যায়—"সে ম্যাডাম্।"

"ইয়েস্ ড্যাম্ "

"হু দি ডেভিল্ ইউ !"

মেমটা বিরক্ত হয়ে চলে যায়। হর্ষবর্ধন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

"তুমি ড্যাম্ বল্লে কিনা, মেমটা চটে গেল তাইতো।" গোবর্ধন উল্লেখ করে।

"হ্যাঁ, আমি ওকে মা বলতে যাই আর কি!" হর্ষবর্ধন ঈষচ্চুষ্ট হন—"আমার বাবা কি ওকে বিয়ে করতে গেছে সাতপুরুষে!"

"মা কেন? ম্যা তো! বললেই পারতে!"

"মা-ও যা ম্যা-ও তাই একই মানে।" হর্ষবর্ধন টীকা করেন—

"আমাদের ভাষায় যাকে মা বলি, ওদের ভাষায় তাকেই বলে ম্যা!"

গোব্‌রা আপত্তি করতে যায়, কিন্তু ওর কথায় কান দ্যান না হর্ষবর্ধন।

"ইংরেজীর তুই কি জানিস রে? তুই শেখাবি আমাকে? আমাকে আর শেখাতে হয় না ইংরেজী!"

"কিন্তু চটে তো গেল মেমটা"—গোবর্ধন তথাপি কিন্তু-কিন্তু।

"বয়েই গেল আমার! মেয়ে ইংরেজ দেখে ভয় খাইনে আমি! আমি কি তোর মতন কাপুরুষ নাকি?" বীরবিক্রমে ভাইকে বিধ্বস্ত করে দ্যান তিনি।"

"ছাগলরাও তো ম্যা বলে! তুমি কি বলতে চাও যে ছাগলরাও তাহলে ইংরেজ?" বেশ গুরুগম্ভীর মুখেই প্রশ্ন হয় গোবর্ধনের।

"বেড়ালও তো ম্যাও বলে, তবে কি তুই বল্‌ছিস্ যে বেড়ালরা সব ছাগল?" হর্ষবর্ধনের বিস্ময় ধরে না। "যদি আমার মত অনেক ভাষা তুই জানতিস্ তাহলে আর এমন কথা বল্‌তিস্ না। ইতর প্রাণীদের ভাষার মধ্যে ওরকম মিল থাকেই প্রায়। না থেকে পারে না।" ভাইয়ের বোধোদয়ের জন্যে নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করতে দ্বিধা হয় না দাদার।

অনেক ভাষা না জেনেও ক্ষোভ যায় না। গোবর্ধনের। সে খুঁৎ খুঁৎ করে তবুও—"ছাগলের ভাষায় আর ইংরেজের ভাষায় তোমার কিন্তু মিলের চেয়ে গরমিলই বেশি দাদা। ছাগলের ভাষা শিখ্‌তে বেশি দেরি লাগে না, ইস্কুলে না গেলেও চলে, ঘরে বসেই শেখা যায় বেশ। কিন্তু ইংরেজের ভাষা শেখা শক্ত কত!"

"শক্ত না ছাই! তোর মত ছাগলের কাছেই শক্ত।" হর্ষবর্ধন গোঁফ চুম্‌রে নেন—"আমার কাছে জল!"

এবার গোবর্ধন চটে! বলে বসে—"তাহলে বলো দেখি খুরির ইংরেজীটা?"

"কেন, বানান তো করেছি? কে এচ্ ইউ—"

"বানান করা আর ইংরেজী করা এক হোলো?"

"পারব না নাকি ইংরেজী করতে? পারব না বুঝি?" হর্ষবর্ধন কথা চিবুতে শুরু করেন। "এমন কি শক্ত কথা শুনি? এক্ষুনি করে দিচ্ছি।" হর্ষবর্ধন স্মৃতির ক্ষেত্র চষে ফেল্‌তে থাকেন—সেই দারুণ কৃষিকার্যের দাগ পড়তে থাকে তাঁর কপালে! প্রাণান্ত পরিশ্রমে তিনি ঘেমে ওঠেন আপাদমস্তক।

গোবর্ধন গুম হয়ে দাদাকে লক্ষ্য করে।

নিতান্তই মুষ্‌ড়ে এসেচেন এমন সময়ে এক আইডিয়া আসে ওঁর মাথায়—ডুবন্ত লোকে যেমন কুটো খুঁজে পায়। ডুবন্ত লোকেরাই পায়, পাওয়াটাই দস্তুর,—ডুবন্তরা আর কুটোরা প্রায় কাছাকাছি থাকে কিনা! কুটোর জন্যেই ডোবা, তাও নেহাত হাতে না পেলে কে আর কষ্ট করে ডুবতে যাবে বলো?

"পেয়েছি! পেয়েছি ইংরেজী!" হঠাৎ লাফিয়ে ওঠেন হর্ষবর্ধন।

"কী শুনি?" গোবর্ধন সন্দেহের হাসি হাসে।

"পেয়েছি! মানে আরেকটু হলেই প্রায় পেয়ে যাই" হর্ষবর্ধন ব্যক্ত করেন, "মানুষের পিঠে সেই যে কী হয় বল্ দেখি তুই, তাহলে এক্ষুনি আমি বলে দিচ্ছি তোকে।"

বিরাট আবিষ্কারের মুখোমুখি এসে বৈজ্ঞানিকের ভাবভঙ্গী যেমন হয় হর্ষবর্ধনের চোখ মুখের এখন সেই অবস্থা। "বল না কী হয় পিঠে ?"

"পিঠে তো চুল হয় না।" গোবর্ধন ঘাড় চুলকোয়—"বুকে হয় বটে। কারু কারু আবার কানেও হতে দেখেচি অবিশ্যি।" গোবরা নিজের কান চুলকায়– কানে চুল হয়েছে কিনা দেখবার জন্যেই কিনা কে জানে !

"যা হয় না আমি কি তাই জিজ্ঞেস করেছি ?" হুম্‌কি দেন হর্ষবর্ধন।

"পিঠে তবে কী হয় ? শিরদাঁড়া ?"

"সে তো হয়েই আছে। আবার হবেটা কি !" ভারি বিরক্ত হন তিনি—"আহা সেই যে যা হলে কেটে বাদ দিতে হয়, তবেই মানুষ বাঁচে। প্রায়ই বাঁচে না আবার"

'কুঁজ নাকি গো দাদা ?"

"তোর মাথা ! বাবা কি আর সাধে নাম দিয়েছিল গোবর্ধন। মাথায় কেবল গোবর।"

"কেন কুঁজই তো হয়ে থাকে পিঠে কুঁজ ছাড়া আর কি হবে ? তুমি কি বলতে চাও তবে গোদ ? না, গলগণ্ড ?"

"আহা সেই যে সনাতনখুড়োর যা হয়েছিল রে একবার ! জেলার ডাক্তার এসে অপারেশন্‌ করল শেষটায় ?"

"ও ? সেই কার্বাংকল ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ। কার্বাংকল। এইবার পাওয়া গেছে।" হর্ষবর্ধনের হর্ষ আর ধরে না। সারা মুখ যেন হাসিখুসির একখানা পৃষ্ঠা হয়ে যায়—"কার্বাংকল থেকে এলো আংকল। আংকল্‌ মানে খুড়ো— তাহলে খুড়ি মানে কি বল্‌তো !"

"আমি কি জানি !" গোবর্ধন ঠোঁট উল্‌টায়, "তুমিই তো বলবে !"

"আহা, আমিই তো বলব! তুই বলবি কোত্থেকে? তোর কি পেটে বিদ্যে আছে তত? তাহলে ঘোড়ার পিঠে পাখী না বসে গাধার পিঠেই বসত গিয়ে! নামই পাল্টে যেত তোর! খুড়ির ইংরেজী?—" মৃদু মধুর হাস্যে ওঁর মুখমণ্ডল ভরে যায়—"খুড়ির ইংরেজী হোল আণ্ট্! আণ্ট্ মানে খুড়ি।"

"জানতাম। তোমার আগেই জানতাম" মুখ ব্যাঁকায় গোবর্ধন। 'আবার আণ্ট্ মানে পিঁপড়েও হয়—তা জানো?"

"হয়ই ত।" হর্ষবর্ধন জোরালো গলা জাহির করেন। "আণ্ট্ তো দুরকমের—এক পিঁপড়েরা আর এক খুড়ি জেঠী। আমি বললুম বলেই জানলি নইলে আর জানতে হতো না তোকে। আমার জানা আছে বেশ!"

গোবর্ধন অনেকটা কাহিল হয়ে আসে—"আচ্ছা, আচ্ছা, আণ্ট্ বানান কর তো দেখি।"

"কেন? সোজাইতো বানান। এ-এন্-টি—আণ্ট। 'এ'-তে 'অ'-ও হয়, 'আ'-ও হয়। ইংরেজীর মজাই ঐ!" মুরুব্বিচালে উনি মাথা চালেন।

"আবার 'এ-ও হয়, জানো?" গোবর্ধন অনুযোগ করে। দাদার অগ্রগতির ধাক্কা সামলানো ওর পক্ষে শক্ত তবু খুব বেশি পিছিয়ে থাকতেও রাজি নয় ও।

"আচ্ছা, সে তো হোলো। খুরি তো পাওয়া গেল। এখন মাখন-কলের ইংরাজী পেলেই তো হয়ে যায়—সাহেবকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে খুঁজে বার করাই জিনিসটা।" হর্ষবর্ধন জিজ্ঞাসু হন—"জানিস্ ওর ইংরেজী?"

"মাখন-কল? কলের ইংরেজী তো জানি— মিল্। যেমন কিনা পেপার মিল্—"

হর্ষবর্ধন উৎসাহ পান—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে এবার। সেই

যে একবার কোন্ পেপার মিল্ একরকমের কাঠের খোঁজ করেছিল না আমাদের কাছে ?"

"হ্যাঁ, আমারও মনে পড়ছে।" গোবর্ধন সাড়া দেয়—"আর মাখন ? মাখন হচ্ছে বাটার্ জানোই তো তুমি। বাট্—বাটার্—বাটেস্ট্। বাট্ মানে হল কিন্তু বাটার মানে মাখন—আর বাটেস্ট্ ? বাটেস্ট্ মানে—?"

বিদ্যার পরিচয় দেবার মুখেই হোঁচট্ খেতে হয় গোব্রাকে।

"বাটেস্টে কাজ কি আমাদের ? বাটার্ই যথেষ্ট।" হর্ষবর্ধন বলেন। "তাহলে মাখন-কল মানে হোলো গিয়ে বাটার-মিল্! কেমন ত ?"

দাদাকে পরামর্শ দেবার সুযোগ পেয়ে গোবর্ধন যেন গলে যায়। "মিল আবার কবিতারও হয় দাদা।" গদ্গদ ভাবে সে জানায়! "তবে কবিতার কলকারখানা হোলো আলাদা।"

"তুই বড্ড বাজে বকিস্ গোব্রা।" হর্ষবর্ধন একটু বিরক্তই হন বলতে কি—"তাহলে কী দাঁড়ালো ? মাখন-কলের খুরি অর্থাৎ আণ্ট অফ্ এ বাটার-মিল্—এই ত ? তাহলে সাহেবকে গিয়ে এই কথাই বলা যাক্—কেমন ?"

এমন সময়ে বেয়ারাটা আবার আসে—"চলিয়ে চেম্বার্মে বড়া সাব্কো পাশ।"

দুরু দুরু বক্ষে দু'ভাই আপিস ঘরে ঢোকে। অভিধানের মতই প্রকাণ্ড বটে ঘরটা তবে ততটা ভয়াবহ নয়। দুজনে গিয়ে দাঁড়ায় টেবিলের কাছে।

"হোয়াট্ ইউ ওয়াণ্ট বাবু ?"—প্রশ্ন এবং চুরুটের ধোঁয়া প্রকাণ্ড এক লালমুখের দু'পাশ দিয়ে একই সময়ে যুগপৎ বাহির হয়।

হর্ষবর্ধন সাহস সঞ্চয় করেন—"উই ওয়াণ্ট ইওর্ আণ্ট"—

হর্ষবর্ধনের বাক্য শেষ হতে পায় না, সাহেবের চুরুট চমকে ওঠে মাঝখানেই—"হোয়াট ?"

"হর্ষবর্ধন একটু জোর পান এবার—"উই ওয়ান্ট ইওর্ আন্ট অফ এ বাটার-মিল্।"

"ইউ ওয়ান্ট্ মাই আন্ট?" গোল চোখ আরও গোলাকার হয়ে আসে সাহেবের। "ইজ্ দ্যাট্ সো?"

গোবর্ধন জবাব দেয়—"ই-য়েস্—স্যার্।" কম্পিত কণ্ঠস্বর।

সাহেবের মুখ থেকে চুরুট্ পড়ে যায় এবং দাঁত কড়্মড়্ করে। কোট্ খুলে টেবিলের উপর ফেলে দ্যায়—আস্তিন গুটায় সে—মাংসপেশীবহুল বিরাট হাত বিরাটতর বদ্ধমুষ্টিতে পরিণত হতে থাকে।

এই বদ্ধমুষ্টি অকস্মাৎ হয়তো ওদের নাকের সম্মুখীন হতে পারে, কেন জানি না, এই রকমের একটা ক্ষীণ আশংকা হতে থাকে গোব্রার।

প্রায় তাই—ঘুষিটা প্রায় মুখের কাছাকাছি এসে যায়······

"ওরে দাদারে—!"

দুর্ঘটনার পূর্ব মুহূর্তেই গোবর্ধন দাদাকে জাপ্টে ধরে উদ্যত মুষ্টিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে উর্ধ্বশ্বাস হয়। বেরুবার মুখে মেমের পা মাড়িয়ে দ্যায়, বেয়ারার সঙ্গে কলিশন্ বাধে, ধাক্কা লেগে একটা শো-কেশ যায় উল্টে, বাঙালী বাবুটি ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্ট হয়ে কোথায় গিয়ে ছিট্কে পড়ে কে জানে! এ-সব দিকে ভ্রূক্ষেপের অবসর কই তখন? তীরের ন্যায় বেরিয়ে একেবারে চৌমাথায় গিয়ে হাঁপ ছাড়ে ওরা।

"বাবাঃ! খুব বেঁচেছি।" গোবর্ধন বলে।

"আরেকটু হলেই—হুঁ।" হাঁপাতে থাকেন হর্ষবর্ধন।

"বাজার করা সোজা নয় এই কলকাতায়।" গোবর্ধন বলে, "বুঝলে দাদা?"

"সনাতনখুড়োর যেমন কাণ্ড!" হর্ষবর্ধন বেজায় রুষ্ট হন—

"কলকাতায় খুরি কিনতে পাঠিয়েছে। ওর খুরির জন্যে প্রাণে মারা পড়ি আর কি!"

"একটা বিয়ে করলেই তো পারে বাপু!" দারুণ অসন্তোষে গোবর্ধনও তেতে ওঠে—"খুড়ির আর দুঃখ থাকে না! মাখন-কলেও লাগিয়ে রাখতে পারে তাকে দিনরাত!"

"যা বলেছিস্ গোবরা!" হর্ষবর্ধন ভায়ের তারিফ করেন—"একটা কথার মত কথা বলেছিস্ বটে এতক্ষণে।"

"হ্যাঁ, তাহলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। একটা সনাতন খুড়ি হয় আমাদের!"

"আমি শুধু ভাবচি ব্যাটারা খুরি বোঝে না, আণ্টও বোঝে না—কী আশ্চর্য! এই বিদ্যে নিয়ে হলাণ্ড থেকে ব্যবসা করতে এসেছে হেথায়. আশ্চর্য!" হর্ষবর্ধন ক্রমশই আরো অবাক হন। —"কি করে যে এরা দোকান চালায় খোদাই জানেন। যে লাল মুখোটা গোড়ায় এগিয়ে এল সেটা তো আস্ত এক আকাঠ। খুরি বানান করে দিলুম তবু বুঝতে পারে না।"

"একেবারে হলধর", গোবর্ধন সায় দেয়।

"হ্যাঁ, সেইটাই হলধর! ঠিক বলেছিস্ তুই।" হর্ষবর্ধন ভাইয়ের কথাই মেনে নেন্—অম্লানবদনেই!

"অনেক কাঠ দেখেছি আমরা। কিনেছি বেচেছিও বিস্তর। কিন্তু এমন আকাঠ দেখিনি কখনো।" গোবর্ধন বলে—"কাঠের ব্যবসা আমাদের। এই আকাঠ নিয়ে কি করব দাদা?"

"কিছু না।···আর যেটা অভিধানের মধ্যে ঢুকে বসে আছে—মুখ গোঁজ করে ঘুষি পাকিয়ে—" ধীরে ধীরে রহস্যকে বিস্তারিত করেন তিনি—"সেই ব্যাটাই হোলো গে—ইন্দ্রসেন। আসল ইন্দ্রসেন। —বুঝেছিস্?

॥ ধূম্রলোকে হর্ষবর্ধন ॥

"বাস্তবিক, গোব্‌রা। বাবা যে বলতেন মিথ্যে না!" হর্ষবর্ধন বলেন গোবর্ধনকে— চাপা গলাতেই বলেন যদিও: "ধূম্রপান করলে মানুষ গাধা হয়ে যায়, সত্যিই!"

কথাটা যথাসাধ্য মুখবিকৃত করেই তিনি বলেন।

গোবর্ধন জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকায়, বোধ হয় উদাহরণের সে অপেক্ষা রাখে।

"সামনেই ছাখ্‌ না, জাজ্বল্যমান! আমাদের সাম্‌নের সীটেই।" হর্ষবর্ধনের যেমনই বিরক্ত মুখ তেমনি বিরস কণ্ঠ।

গোব্‌রা দৃষ্টিপাত করে বটে কিন্তু সম্মুখীন ব্যক্তিকে অতখানি সম্মানের আসন দেবার সঙ্গত কারণ সে খুঁজে পায় না। যাকে তাকে পদমর্যাদায় দিয়ে দিলেই হোলো অম্‌নি? গোরু-গাধার পদগৌরব কি খোলামকুচি নাকি?

"এই···এই লোকটা এতখানি রাস্তা আমাদের সঙ্গেই আসছিল, আমাদের আগে-আগেই—"

হর্ষবর্ধন বিবৃত করেন, বিকৃত-মুখেই :

"এই চুরুট্‌টা হাতেই ছিল ওর, এতক্ষণ ধরেই ছিল, কিন্তু এতখানি রাস্তায় একবারও ওর ধরাবার হুঁস্ হয়নি। কিন্তু এখন বাসে উঠে, আর আমরাও উঠেছি সেই সঙ্গে—এখন কিনা আমাদের সামনের সীটে বসে সিগারেট ধরানো হয়েছে বাবুর! ছ্যা!"

"ও যে সিগারেট খায় খেতে জানে, সেটা বোধ হয় জানাতে চায় আমাদের।" গোবর্ধন মন্তব্য করে। "এতগুলো লোককে একসঙ্গে একজায়গায় জড়ো করা পাচ্ছে তো।"

"ও তো টানছে আরামে, আমাদের না ব্যায়রামে ধরে আবার।" হর্ষবর্ধন ঠোঁট ওল্‌টান্।

"কেন, ব্যায়রাম কেন?" শোনামাত্রই আতঙ্ক হয় গোব্‌রার, আধিব্যাধিতে তার ভারী ভয়।

"কিসের ব্যারাম দাদা?"

"চোখের, আবার কিসের?" করযোড়ে উভয় নেত্রের শুশ্রূষা করতে করতে বলেন হর্ষবর্ধন : "বলছি কি তবে? সিগারেটের ছাই উড়ছে দেখছিস না? চোখে এসে পড়ছে যে! তখন থেকে এমন কর্‌কর্ করছে আমার।"

তাঁর চোখা অভিযোগ। চোখা এবং রোখা।

আঁৎকে ওঠে গোবর্ধন : "তাইতো। ভারি মুস্কিল তো।" তক্ষুনি সে নিজের চোখ সাম্‌লাতে ব্যস্ত হয়। কিন্তু নজর নীচু করতে না করতেই কে যেন চাবুক মারে তার পিঠে। চম্‌কে উঠে চল্‌কে ওঠে সে। তার অবারিত পৃষ্ঠদেশে না জানিয়েই কে যেন কশাঘাত কসিয়ে দিয়েছে—এমনি করে তোলে নিজের মুখখানা।

"দ্যাখো দ্যাখো দাদা, কী করেছে দ্যাখো। চুরুট্ থেকে আগুনের

ফুল্‌কি উড়ে এসে আমার আলোয়ানটার কী দশা করেছে ছাখো। ক'জায়গায় ছ্যাঁদা করে দিয়েছে ছাখো একবার!"

চাপা গলার চীৎকারে দাদার দৃষ্টি সে আকর্ষণ করে। "দামী আলোয়ানটা। হায় হায়!" গোবর্ধনের দীর্ঘনিশ্বাস পড়তে থাকে ঃ "কী করা যাবে? হায় হায়! ভদ্রলোককে তো আর চড় মারা যায় না।" গোবর্ধন তার তেমন চাড়ও দেখায় না।

"উহু!" হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়েন। "ভদ্রতায় বাধে যে। মনেও আনিসনি ও-কথা। বরং মনে আনতে পারিস কিন্তু মুখে কদাচ না। যদি বা কষ্টে সৃষ্টে মুখে আনা চলে কিন্তু হাতে? কদাপি—কদাপি নয়।"

হর্ষবর্ধন স্বকীয় আলোয়ানে বিনীত দৃষ্টি বিন্যস্ত করেন। চারি-ধারে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করে দেখেন, কিন্তু নাঃ, কেবল চোখের ওপর দিয়েই গেছে, দেহের সংযুক্ত-প্রদেশে তেমন কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয়নি তাঁর।

"বাবা কি মিথ্যে বলেছেন? ধূমপান করলে—? দেখছিস্ তো একেবারেই মাথা নেই লোকটার।" হর্ষবর্ধনের পুনরুক্তি হয়: "ধূম্রপান করলে মাথা খাখাপ হয়ে যায় ঠিকই। আর মাথা গেল কি গাধা হোলো। আর গাধাও যা—"

ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত ভাষা খুঁজে না পেয়ে হর্ষবর্ধনকে থামতে হয়।

"—আর হাঁদাও তাই।" একটুও না ভেবেই গোবর্ধন বলে ছায় সগর্বে।

"হাঁদা বলে হাঁদা।" হর্ষবর্ধন সায় ছান্ ভায়ের: চুরুট্ টান্‌ছেন বাবু। পেছনে যে এক জোড়া করে চোখ আছে—জোড়ায় জোড়ায় আছে—সেদিকে হুঁস নেই।"

"নেই বলে' নেই।" গোবর্ধনও রাগে বেহুঁস্।

"এমন কি দু-জোড়া করে যে পা নয় আমাদের, সে খেয়ালও নেই ভদ্রলোকের।"

"পা? দু-জোড়া? কেন, দু-জোড়া পা কেন?" গোবর্ধন প্রাঞ্জলতার পক্ষপাতী।

"আমরা তো আর চারপেয়ে নই ওর মতো যে ধূম্রপান করে আরাম পাবো।" হর্ষবর্ধনের ব্যাখ্যানা হয়ঃ "ধূম্রপানের ধ-ও নেই আমাদের। কাকে বলে সিগ্রেট তাই জানিনে।"

"সিগারেট খাবিতো যা বাপু সব্বার পিছনের সীটে। অত যদি ধূ—ধূ—ধূ ধূম্ড়োপানের সখ।" সাধু ভাষা সহজে বেরুতে চায় না গোব্রার মুখে, চিরকাল কথ্য ভাষাতেই কথা বলার বদভ্যাস, অকথ্য ভাষায় তেমন সুবিধা করে উঠতে পারে না সে।

"তা না, আরাম করে এসে বসেছেন সবার সাম্নে। কেমন জাকিয়ে বসা হয়েছে আবার ছাখোনা।" অসন্তোষ জ্ঞাপন না করে পারে না গোব্রা।

"কী রকম ধুম্ ধাম্ করে টান্ছে ছাখ না।"

"ধূম্ড়োলোচন।" গোবরার স্পষ্টবাদিতা আর অস্পষ্ট থাকে না—"আস্ত একটি ধূম্ড়োলোচন।"

এতক্ষণ কানাকানিই চলছিল ওদের। কিন্তু উৎসাহের আতিশয্যে শেষ কথাটা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেই, ধূম্ড়ো লোকটার কানে গিয়ে সেধোয়। জাজ্জল্যমান দৃষ্টান্তটি পিছন ফিরে তাকান। দুই ভাই চুপ মেরে যায়, প্রশংসাপত্র লুকিয়ে ফ্যালে তক্ষুনি, একেবারে অনেকক্ষণের মতো চেপে যায়। ধূম্রলোচনের চিম্নি থেকে আরো বেশি ধোঁয়া বেরুতে থাকে।

ধোঁয়ার ধাক্কা এসে চোখে মুখে লাগে, নাকের মধ্যে ঢোকে ওদের। হর্ষবর্ধন বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়েন আর গোবর্ধন? সে একেবারে পর্য্যবসিত হয়ে যায়।

"আঃ, কী বিশ্রী গন্ধ রে বাব্বাঃ!" হর্ষবর্ধন মৌনব্রত ভঙ্গ করেন অবশেষেঃ "নাকের ভেতর জ্বালা করছে আমার।"

"আর কি কড়া ধোঁয়া রে দাদা !" গোবর্ধনও আর চাপতে পারে না : "চোখের জল বার করে ছাড়ল !"

"আমাকেও কাঁদিয়ে দিয়েছে ভাই।" হর্ষবর্ধন করুণ কণ্ঠেই জানান। তখন থেকে কচ্‌লে কচ্‌লে তিনি ফুলিয়ে ফেলেছেন দুচোখ, চোখ লাল করে, অশ্রুপূর্ণ লোচনে তিনি ভায়ের দিকে তাকান্। "না টেনেই আমরা চোখের জলে নাকের জলে,'—হর্ষবর্ধন নাসিকা ঝেড়ে অশ্রুমোচন করেন : "আর ওদিকে ও কী আরাম যে পাচ্ছে টেনে ওই জানে !"

তারপরে নিজের আলোয়ানের খুঁটে গোবরার নাকের জল সস্নেহে মুছিয়ে ছান তিনি।

'আমি জানি দাদা !" স্নেহবিগলিত হয়ে, দুর্বল মুহূর্তে বলে ফ্যালে গোবর্ধন। কিন্তু বলে ফেলেই, গুপ্ত কথা সত্যিসত্যিই ব্যক্ত করবে কিনা, ভেবে ইতস্তত করতে থাকে। নিজের দ্বিতীয় রূপ ধাঁ করে প্রকাশ করা উচিত হবে কিনা সে সম্বন্ধে তার দ্বিধা জাগে।

"হ্যাঁ! তুই আবার জানিস! তুই কি কখনও টেনেছিস যে জানবি ?" হর্ষবর্ধনের বদ্ধমূল অবিশ্বাস।

"একবার টেনেছিলাম দাদা! গোবরা অগত্যা গোপনকাহিনী বেফাঁস করেই বসে : "পাঠশালায় পড়তে, ছোটবেলায়। লুকিয়ে একটান কেবল। কাশতে কাশতে মাথা ঘুরে দম আটকে মারা যাই আর কি শেষটায় !"

"বটে বটে ? টেনে- দেখেছিস নাকি ? ভাইকে অকস্মাৎ শ্রেষ্ঠতর পর্যায়ের বলে' তাঁর সন্দেহ হতে থাকে। "বলিস কি রে তুই।"

কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁর প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা প্রকাশ্য জিঘাংসায় জাহির হয়ে পড়ে : "তাইতো বলি আমি—কেন যে কোনো কথা মনে থাকে না তোর—কেন যে তোর মাথায় কিচ্ছু নেই—জানা গেল এবার। কেন যে তোর চাক্ বেবাক্ ফাঁক—বুঝলাম এতদিনে !"

গোবর্ধন নাকে আলোয়ান চাপা দ্যায়— তার নিজের নাকে। যা ধূম্রপান, নির্বুদ্ধিতার বশে, অজ্ঞান অবস্থায় (বলতে গেলে, প্রায় অজান্তেই) হয়ে গেছে, তার তো আর চারা নেই—কিন্তু সেই সর্বনাশকে আর বাড়ানো কেন আবার? ধোঁয়ার ধাক্কায় এতক্ষণ তো কাহিল হয়ে ছিলই, দাদার আবিষ্কারের ধুম ধাড়াক্কায় আরো সে কাবু হয়ে পড়ে এখন। প্রথমে সে হাত দিয়েই সেই ডাইনী ধূমাবতীদের তাড়াতে চায়, শূন্য-মার্গেই চড়চাপড় চালাতে থাকে, কিন্তু সে সূক্ষ্মশরীরীরা কি সহজে তাড়িত হবার? অনন্যোপায় হয়ে, আলোয়ানের সাহায্যেই গোঁয়ার হয়ে তাকে ধোঁয়ার তাল সামলাতে হয়।

নাকের দুর্গ রক্ষা করে, আসন্ন দুর্গতি বাঁচিয়ে, তারপরে সে মাথা বাঁচাতে চেষ্টা করে। মাথা মানে তার মাথার মর্যাদা। সে বলে: "বাঃ, আর তুমি বুঝি হুঁকো টানতে না ছেলেবেলায়? হুঁকো খেলে বুঝি ধুমড়োপান করা হয় না? বটে?"

প্রতিপক্ষের মাথা ফাটানোই নিজের মাথা বাঁচানোর সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলে গোবরার ধারণা।

"হ্যাঁ, বললেই হলো আর কি।" আমলই দ্যান না হর্ষবর্ধন।

"মামার হুঁকোয় টান মারতে না তুমি? সত্যি করে বলো?"

হর্ষবর্ধন এবার ঈষদুষ্ণই হন: "তোর কি আক্কেল গোবরা? হুঁকো খেলে এঁটো খাওয়া হয় তা জানিস? আর আমাকে কখনও দেখেছিস কারো এঁটো খেতে? বলে বাবারই এঁটো খাইনি কখনো—তাই কতো লোকে আগ্রহ করে খায়! পেলেই খেয়ে ফ্যালে! আর আমি কিনা খাবো মামার এঁটো হুঁকোয়—ছ্যাঃ! বলতে পারে না কেউ। হুম্ বাবা!"

'মাথা থাকলে তো তা মনে থাকবে তোমার। গোবর্ধনও গরম হয়ে ওঠে: "ধুমড়োপান করলে কি আর মাথা থাকে? একেবারে কুমড়ো হয়ে যায় মানুষ! তখন কেবল চালের ওপর চলে।

আসল চাল কুমড়োদের মতন। আমি স্বচক্ষে দেখেছি তোমায় মামার হুঁকোয় টান মারতে। কতবারই দেখেছি। বললে শুনব কেন?" গোবরা কিছুতেই নিজের গোঁ ছাড়ে না।

"দেখেছিস তো কী হয়েছে? সে কক্ষনো মামা খেয়ে যাবার পরে নয়, দিব্যি গেলে বলতে পারি। তার আগে, তার ঢের আগে। মামা যখন খায়নি তখন খেয়েছি। দেখে ফেলেছিস তো মাথা কিনেছিস আর কি আমার।"

"বেশ তাহলেই হলো। ধূমড়োপান নিয়ে কথা।" গোবরা দাদাকে একেবারে ল্যাজে-গোবরে করে ছায়।

"তোর যেমন মাথা। হুঁকো টানলেই ধূম্রপান হয় বুঝি?" হর্ষবর্ধন সত্যিই এবার খাপ্পা হন: "বলি সে হুঁকোর মাথায় কি কলকে বসানো থাকত, শুনি? ধোঁয়াই হতো না তো ধূম্রপান! তামাকের সঙ্গে টিকের সম্পর্ক নেই—যাকে বলে কাকস্য পরিবেদনা। ধূম্রপান করেছি নাকি আমি?" খুঁটি-নাটির দিকে তাঁর কড়া নজর।

'কলকেও টানে, আবার হুঁকোও টানে মানুষ—আলাদা আলাদাও টানা যায় ওদের! ওদের একটাকে ধরে টান মারলেই হোলো। কলকে না থাকলো তো কী হয়েছে?"

গোবরার চুলচেরা বিতর্ক।

"বাঃ, সে তো এমনি কেবল ফড়র ফড়র করে হুঁকোটাই টানতাম, প্রাস্টিক্ করতাম কেবল—টেনে টেনে দেখতাম কেমন।"

"প্রাস্টিকই করো, আর প্রাক্টিসই করো—একই কথা হোলো! তাতেই ঘ্রাণে অর্দ্ধেক ভোজন হয়ে গেছে। নিশ্চয় মাথার আদ্দেক আর নেই কো তোমার আধখানা খোয়া গেছে আলবাৎ। হলপ করে বলে দিতে পারি আমি।"

গোবর্ধন জোর গলাতেই তার গবেষণা জাহির করে: তখনই খোয়া গেছে, সেইদিনই, তৎক্ষণাৎ গেছে। হুঁকো একবার টানলেই হোলো। আর কি রক্ষে আছে তাহলে?"

'সে যদি তোর ধূম্রপান হয়ে থাকে তাহলে তোকে টানলেও আমার ধূম্রপান হয়। আলবাৎ হয়।"

এই বলে গোব্‌রার ঘাড় ধরে সজোরে টান লাগান হর্ষবর্ধন। আস্ত একটা অবতার বলেই, ওকে, তাঁর চিরকালের ধারণা—এমনকি, প্রায় বদ্ধমূল কুসংস্কারই দাঁড়িয়ে গেছে, বলতে গেলে। কিন্তু, না—হুঁকো নয়—ভগবানের দশম দশার—সাক্ষাৎ কল্কি বলেই ওঁর ভ্রম হতে থাকে এখন।

"কিন্তু যাই বলো দাদা, ধূমড়োপান করলে আর রক্ষে নেই। মাথার দফা তক্ষুনি গয়া। নয় কি?" গোব্‌রাও দাদাকে টেনে নিজের দল ভারী করতে চায়ঃ "তোমারও মাথা নেই, আমারও মাথা নেই। দুজনেরই কারু মাথা নেই একেবারে। কেউ যে মাথায় হাত বুলিয়ে আরাম পাবে তার উপায় নেই"—হাসিমুখেই ওর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে।

"যাক গে, যেতে দে আর উচ্চবাচ্য করিস নে। লোকে না টের পেলেই হোলো। চেপে যা। ঘাড়ের ওপর একটা এই ধরণের কিছু থাকা নিয়ে কথা। তার ভেতরে কী আছে না আছে, ঘিলু আছে কি গোবর আছে, কে দেখতে গেছে? কিন্তু যাই বল গোব্‌রা, গন্ধটা নেহাৎ মন্দ না রে। ধোঁয়া পাচ্ছিস্ চুরুটের? আমার তো বেশ ভালোই লাগছে রে ভাই।"

"হ্যাঁ ধুমড়োপান করি আর কি তোমার কথায়। যাও বা একটু মাথা আছে তাও যাক্।"

নাকের উপর থেকে আলোয়ানের চাপ আলগা করতে একদম আগ্রহ নেই গোব্‌রার।

"পরের পরামর্শ শুনে মরি আর কি!" সে বলে।

"খাসা খোসবাই কিন্তু ভাই।" দাদা নাক ভরে প্রাণপণে আঘ্রাণ নেনঃ

"শুঁকতেই এমন। খেতে কেমন কে জানে!"

গোবর্ধন তবু প্রলুব্ধ হয় না। "ও টানছে টানছে, তুমি আবার গায়ে পড়ে ধুমড়োপান করতে যাচ্ছ কেন? মরবে শেষটায়? মাথা খাবে নিজের? নিজের মস্তকটি নিজেই চর্বণ করবে নাকি?"

দাদাকে সে সাবধান করতেই চায়!

"যা—যা—!"

হর্ষবর্ধন দাবড়ে দ্যান গোবরাকে:

"এত মাথা ব্যথা কেন রে তোর? নিজের মাথা কোথায় তার ঠিক নেই, পাত্তাই নেই তার—উনি এসেছেন পরের মাথা সামলাতে! আক্কেল দ্যাখ না! মাথা নেই তো মাথা ব্যথা!"

য়্যাঁ? বাত্যা-তাড়িত ধোঁয়া হজম করেই দাদার মাথার গয়া হয়ে গেল নাকি গো? এসব তো মাথা খারাপেরই দুর্লক্ষণ। ধুমড়ো-পানের অপকারিতার ভয়াবহ উপসর্গ সব? তাই নয় কি?

দাদার কাঁধের ওপরের সেই বাহুল্য-মাত্রের দিকে সে তাকায় আর মাথা ঘামাতে থাকে।

মাঝপথে দাদা বাস থেকে নামতে ব্যস্ত হন হঠাৎ—"চ চ'—নেমে পড়ি চ'! ওঠ ওঠ।"

গোবরা বিস্মিত হয়—"বাঃ, এখানে কেন? আমরা কালীঘাটে নামবো যে? কালীদর্শনে যাচ্ছি না?"

"দুত্তোর কালীদর্শন। লোকটা নেমে গেল যে দেখছিস নে!" হর্ষবর্ধন চোখে কেবল ধোঁয়া দেখছেন তখন: "ওই চুরোটগুলো কোথায় কিনতে পাওয়া যায় জেনে নিতাম ওর কাছে।"

গোবরার মুখে রা নেই। পরস্মৈপদী এই যৎসামান্য ধুমড়োপানের বিকল্পেই, দেখতে না দেখতে দাদার মস্তিষ্ক-বিপর্যয় ঘটে গেছে; সত্যিই তবে তাই। কী সর্বনাশ! ভাবতেও তার রোমাঞ্চ হয়।

হর্ষবর্ধন, বেশি কথার ফুরসৎ না দিয়ে, এক হ্যাঁচকায়, ওকে টেনে নিয়ে হুড়মুড় করে নেমে পড়েন মাঝ-রাস্তায়।

বাস থেকে নেমেই চুরুটটা ফেলে দিয়েছিলেন ভদ্রলোক, পেল্লায় একটান মেরে দিয়েই না! সামান্যই তখন ভুক্তাবশিষ্ট ছিল সেটার।

চুরুটের সেই উপসংহার—সেই ধ্বংসাবশেষকে ধূলিশয্যা থেকে সাগ্রহে কুড়িয়ে নিলেন হর্ষবর্ধন। তারপরে কাছাকাছি একটা বাড়ীর রোয়াকে গিয়ে আয়েস করে বসে আরামে টান মারতে সুরু করলেন।

গোবর্ধন হাঁ হাঁ করে ওঠে: "এঁঠো, এঁঠো। করছ কি দাদা? এঁঠো যে—এঁঠো খাচ্ছো ওই লোকটার!"

হর্ষবর্ধন তথাপি ক্ষান্ত হন না। প্রায় ওটাকে মুখস্ত করে ফেলেছেন ততক্ষণে।

"পরের খেয়ে-ফেলে-দেয়া জিনিসটা খাচ্ছ তুমি?" গোবর্ধন বিস্ময়ে ভেঙে পড়ে: "অবাক্ করলে দাদা। বলছিলে না যে বাবার এঁঠোও তুমি নাকি খাও না বড়?"

"যা—যাঃ! ওই লোকটা কি আমার বাবা নাকি? ওর এঁঠো খাব না কেন? ও তো আমার মামাও নয়, ওর এঁঠো খেতে কী হয়েছে?" টানের চোটে হর্ষবর্ধন প্রধূমিত হয়ে ওঠেন সঙ্গে সঙ্গে।

"নাইবা হোলো বাবা, তাই বলে তুমি···"

"যা—যাঃ। নিজের চরখায় তেল দে গে। বুড়ো বাপকে তোর আর গায়ত্রী শেখাতে হবে না।"

একটার পর একটা, তারপর আর একটা—এমনি করে, চুরুটের সঙ্গে তাঁর টানাটানি চলতে থাকে। অবশেষে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ধূমায়িত হয়ে অমায়িক ভাবে তিনি হাসেন। আরামে তাঁর চোখ বুজে আসে। হাতটা বাড়িয়ে গোবর্ধনের দিকে চুরুটের পরিশিষ্টটা এগিয়ে ধরে বলেন—"তোর মাথায় ত' কিছুই নেই—একেবারে ফাঁকা—নে একটু ধোঁয়া দিয়ে ভরিয়ে নে—"

গোব্‌রা থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বিস্ময়ে থই পায়না। ধুমড়ো-পানের কুফল তার চোখের সামনে ধূমায়মান হয়ে ওঠে। তার দাদাকেই ধূমড়োলোচনের দ্বিতীয় সংস্করণ রূপে প্রকাশিত হতে দেখে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে আসে।

ভগ্ন কণ্ঠে সে বলে: 'দাদা, শেষটায় তুমিও—তুমিও একটা ধু ধু-ধু—

কিন্তু ধূয়ো না ধরেই সে থেমে যায়।

॥ ডাক্তার ডাকলেন হর্ষবর্ধন ॥

'বউয়ের ভারী অসুখ মশাই। কোন ডাক্তারকে ডাকা যায় বলুন তো?' হর্ষবর্ধন এসে শুধোলেন আমায়।

'কেন, আমাদের রাম ডাক্তারকে?' বললাম আমি। তারপর তাঁর ভারী ফীজ-এর কথা ভেবে নিয়ে বলি আবার: রাম ডাক্তারকে আনার ব্যয় অনেক, কিন্তু ব্যায়রাম সারাতে তাঁর মতন আর হয় না।'

'বলে বৌয়ের আমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি, আমি কি এখন টাকার কথা ভাবছি নাকি!' তিনি জানান—'বউয়ের আমার আরাম হওয়া নিয়ে কথা।'

'কী হয়েছে তাঁর?' আমি জানতে চাই।

'কী যে হয়েছে তাই তো বোঝা যাচ্ছে না সঠিক। এই বলছে মাথা ধরেছে, এই বলছে দাঁত কনকন, এই বলছে পেট কামড়াচ্ছে....'

'এসব তো ছেলেপিলের অসুখ, ইস্কুলে যাবার সময় হয়' আমি বলি—'তবে মেয়েদের পেটের খবর কে রাখে। বলতে পারে কেউ?'

'বউদির পেটে কিছু হয়নি তো দাদা।' জিজ্ঞেস করে গোবরা। দাদার সাথে সাথেই সে এসেছিল।

'পেটে আবার কী হবে শুনি?' ভায়ের প্রশ্নে দাদা ভ্রূকুঞ্চিত করেন: 'পেটে তো লিভার পিলে হয়ে থাকে। তুই কি লিভার পিলের ব্যামো হয়েছে, তাই বলছিস?'

'আমি ছেলেপিলের কথা বলছিলাম'

'ছেলেপিলে হওয়াটা কি একটা ব্যামো নাকি আবার?'

হর্ষবর্ধন ভায়ের কথায় আরো বেশি খাপ্পা হন: 'সে হওয়া তো ভাগ্যের কথা রে। তেমন ভাগ্য কি আমাদের হবে?' বলে তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফ্যালেন।

'হতে পারে মশাই? গোবরা ভায়া ঠিকই আন্দাজ করেছে হয়ত।' ওর সমর্থনে দাঁড়াই: 'পেটে ছেলে হলে শুনেছি অমনটাই নাকি হয়—মাথা ধরে গা বমি বমি করে, পেট কামড়ায়... ছেলেটাই কামড়ায় কি না কে জানে।'

ছেলের কামড়ের কথায় কথাটা মনে পড়ে গেল আমার...

হর্ষবর্ধনের এক আধুনিকা শ্যালিকা একবার বেড়াতে এসেছিলেন ওঁদের বাড়ি একটা বাচ্চা ছেলেকে কোলে নিয়ে····

ফুটফুটে ছেলেটিকে দেখে কোলে করে একটু আদর করার জন্যে নিয়েছিলাম, তারপরে দাঁত গজিয়েছে কি না দেখবার জন্যে যেই না ওর মুখের মধ্যে আঙুল দিয়েছি—উক! লাফিয়ে উঠতে হয়েছে আমায়।

'কী হোলো কী হোলো?' ব্যস্ত হয়ে উঠলেন হর্ষবর্ধনের বউ।

'কিছু হয়নি।' আমি বললাম: 'একটু দন্তস্ফুট হল মাত্র। হাতে হাতে দাঁত দেখিয়েছে ছেলেটা।'

'ছেলের মুখে আঙুল দিলেন যে বড়?' রাগ করলেন হর্ষবর্ধনের শালী: 'আঙুলটা আপনার অ্যান্টিসেপটিক করে নিয়েছিলেন?'

'অ্যান্টিসেপটিক?' কথাটায় আমি অবাক হই। —'সে আবার কি?'

'লেখক নাকি আপনি? হাইজীনের জ্ঞান নেই আপনার?' বলে একখানা টেক্সট বই এনে আমার নাকের সামনে তিনি খাড়া করেন। তারপরে আমি চোখ দিচ্ছি না দেখে খানিকটা তার তিনি নিজেই আমায় পড়ে শোনান:

'শিশুদের মুখে কোনো খাদ্য দেবার আগে সেটা গরম জলে উত্তম রূপে ফুটিয়ে নিতে হবে···'

'আঙুল কি একটা খাদ্য না কি?' বাধা দিয়ে শুধান হর্ষবর্ধনপত্নী।

'একদম অখাদ্য। অন্ততঃ পরের আঙুল তো বটেই। গোবরাভায়া মুখ গোমড়া করে বলে: 'নিজের আঙুল কেউ কেউ খায় বটে দেখেছি, কিন্তু পরের আঙুল খেতে কখনো কাউকে দেখা যায়নি।

'আঙুল আমি ফুটিয়ে নিইনি সে কথা ঠিক, আমতা আমতা

করে আমার সাফাই গাই : 'তবে আপনার ছেলেই আঙুলটা আমায় ফুটিয়ে নিয়েছে। কিম্বা ফুটিয়ে দিয়েছে...যাই বলুন। এই দেখুন না।'

বলে খোকার দাঁত বসানোর দগদগে দাগ তার মাকে দেখাই। ফুটফুটে বলে কোলে নিয়েছিলাম কিন্তু এতটাই যে ফুটবে তা আমার ধারণা ছিল না, সত্যি।

'রাম ডাক্তারকে আনবার ব্যবস্থা করুন তাহলে।' বললাম হর্ষবর্ধনবাবুকে : 'কল দিন তাঁকে এক্ষুনি। ডাকান কাউকে পাঠিয়ে।'

'ডাকলে কি তিনি আসবেন?' তাঁর সংশয় দেখা যায়।

'সে কি! কল পেলেই শুনেছি ডাক্তাররা বিকল হয়ে পড়ে— না এসে পারে কখনো? উপযুক্ত ফী দিলে কোন্ ডাক্তার আসে না? কী যে বলেন আপনি।

'ডেকেছিলাম একবার। এসেও ছিলেন তিনি। কিন্তু জানেন তো, আমার হাঁস মুর্গি পোষার বাতিক। বাড়ির পেছনে ফাঁকা জায়গাটায় আমার কাঠ চেরাই কারখানার পাশেই পোলট্রির মতন একটুখানি করেছি। তা, হাঁসগুলো আমার এমন বেয়াড়া যে বাড়ির সামনেও এসে পড়ে একেক সময়। রাম ডাক্তারকে দেখেই না সেদিন তারা এমন হাঁক ডাক লাগিয়ে দিল যে...'

'ডাক্তারকেই ডাকছিল বুঝি?'

'কে জানে! তাদের আবার ডাক্তার ডাকার দরকার কি মশাই? তারা কি চিকিচ্ছের কিছু বোঝে? মনে তো হয় না। হয়ত তাঁর বিরাট ব্যাগ দেখেই ভয় খেয়ে ডাকাডাকি লাগিয়েছিল তারা, কিন্তু হাঁসদের সেই ডাক শুনেই না, গেট থেকেই ডাক্তারবাবু বিদায় নিলেন, বাড়ির ভেতরে এলেনই না আর। রেগে টং হয়ে চলে গেলেন একেবারে।'

'বলেন কি?' শুনে আমি অবাক হই।

'হ্যাঁ মশাই।' তারপর আরো কতোবার তাঁকে কল দেয়া

হয়েছে—মোটা ফীয়ের লোভ দেখিয়েছি। কিন্তু এ বাড়ীর ছায়া মাড়াতেও তিনি নারাজ।'

'আশ্চর্য তো। কিন্তু এ পাড়ায় ভালো ডাক্তার বলতে তো উনিই। রাম ডাক্তার ছাড়া তো কেউ নেই এখানে আর....'

'দেখুন, যদি বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোনো রকমে আপনি আনতে পারেন তাঁকে...' হর্ষবর্ধন আমায় অনুনয় করেন।

'দেখি চেষ্টাচরিত্র করে,' বলে আমি রাম ডাক্তারের উদ্দেশ্যে রওনা হই।

সত্যি, একেকটা ডাক্তার এমন অবুঝ হয়। এই রাম ডাক্তারের কথাই ধরা যাক না।'

সেবার পড়ে গিয়ে বিনির একটু ছড়ে যেতেই বাড়িতে এসে দেখবার জন্যে তাঁকে ডাকতে গেছি, কিন্তু যেই না বলেছি, 'ডাক্তার-বাবু, পড়ে গিয়ে ছড়ে গেছে যদি ত্থাখেন এসে একটু দয়া করে...'

'ছড়ে গেছে? রক্ত পড়েছে?'

'তা, একটু রক্তপাত হয়েছে বই কি।'

'সর্বনাশ! এই কলকাতা শহরে পড়ে গিয়ে ছড়ে যাওয়া আর রক্তপাত হওয়া ভারী ভয়ংকর কথা, দেখি তো...'

বলেই তিনি তাঁর ডাক্তারি ব্যাগের ভেতর থেকে থার্মোমিটারটা বার করে আমার মুখের মধ্যে গুঁজে দিলেন...

'এবার শুয়ে পড়ুন তো চট করে।' বলে আমায় একটি কথাও আর কইতে না দিয়ে ঘাড় ধরে শুইয়ে দিলেন তাঁর টেবিলের ওপরে....

'শুয়ে পড়ুন। শুয়ে পড়ুন চট করে। আর একটি কথাও নয়।'

মুখগহ্বরে থার্মোমিটার নিয়ে কথা বলবো তার উপায় কি। প্রতিবাদ করার যো-ই পেলাম না। আর তিনি সেই ফাঁকে পেল্লায় একটা সিরিঞ্জ দিয়ে একখানা ইন্‌জেকশন ঠুকে দিলেন আমায়।

'ব্যাস্! আর কোনো ভয় নেই। অ্যান্‌টি-টিটেনাস ইন্‌জেকসন দিয়ে দিলাম। ধনুষ্টঙ্কারের ভয় রইলো না আর।' বলে আমার মুখের থেকে থার্মোমিটারটা বার করলেন, করে দেখে বললেন— 'জ্বরটরও হয়নি তো। নাঃ! ভয় নেই কোনো আর। বেঁচে গেলেন এ যাত্রা।'

মুখ খোলা পেতে তখন আমি বলবার ফুরসত পেলাম—'ডাক্তারবাবু। আমার তো কিছু হয়নি। আমি পড়ে যাইনি, ছড়ে যায়নি আমার। আমার বোন বিনিই পড়ে গিয়ে ছড়ে গেছে। কথাটা আপনি না বুঝেই…'

'ওঃ, তাই নাকি? তা বলতে হয় আগে। যাক্, যা হবার হয়ে গেছে। চলুন তাকেও একটা ইন্‌জেকসন দিয়ে আসি তাহলে। ছড়ে যাবার পর ডেটল দেওয়া হয়েছিল? ডেটল কি আইডিন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তবে তো হয়েইছে। তবু চলুন, ইন্‌জেকসনটা দিয়ে আসি গে। সাবধানের মার নেই, বলে কথায়।

বিবেচনা করে বিনির ইন্‌জেকসনের বিনিময়ে তিনি আর কিছু নিলেন না, আমারটার দাম দিতে হোলো অবিশ্যি। প্লাস তাঁর কলের দরুণ ভিজিট।

সেই অবুঝ রাম ডাক্তারের কাছে যেতে হচ্ছে আমায় আজ। বেশ ভয়ে ভয়েই আমি এগোই…বলতে কি।

বুঝে সুঝে পাড়তে হবে কথাটা, বেশ বুঝিয়ে সুঝিয়ে....যা অবুঝ ডাক্তার বাবা!

চেম্বারে ঢুকে দূর থেকেই তাঁকে নমস্কার জানাই।

'ডাক্তারবাবু। আপনাকে কল দিতে এসেছি। কিন্তু আমার নিজের জন্য নয়। আমার কোনো অসুখ করেনি, কিচ্ছু হয়নি আমার। পড়ে যাই নি, ছড়ে যায় নি। আমাকে ধরে আবার ফুঁড়ে টুড়ে দেবেন না যেন সেই সেবারের মতন· '

বলে হর্ষবর্ধন বাবুর কথাটা পাড়লাম।

শুনেই না তিনি, আমাকে তেড়ে এসে ফুঁড়ে না দিলেও এমন তেড়ে ফুঁড়ে উঠলেন যে আর বলবার নয়।

'নাঃ, ওদের বাড়ি আমি যাব না। প্রাণ থাকতে নয়, এ জন্মে না। ওরা ভারি অভদ্দর...'

'হর্ষবর্ধনবাবু অভদ্র! এমন কথা বলবেন না। ওঁর শত্রুতেও এমন কথা বলে না—বলতে পারে না।'

'অভদ্র না তো কি? বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে অপমান করাটা কি ভদ্রতা না কি তাহলে?'

'আপনাকে বাড়িতে ডেকে এনে অপমান করেছেন উনি? বিশ্বাস হয় না মশাই! আপনি ভুল বুঝেছেন। আপনি যা অ...' বলতে গিয়ে 'অবুঝ' কথাটা আমি চেপে যাই একেবারে।

'উনি নিজে না করলেও ওঁর পোষা হাঁসদের দিয়ে করিয়েছেন। সে একই কথা হল।'

'হাঁসদের দিয়ে অপমান? আমার বিশ্বাস হয় না।'

'হ্যাঁ মশাই! মিথ্যে বলছি আপনাকে? আমাকে দেখেই না তাঁর সেই পাজী হাঁসগুলো এমন গালাগালি শুরু করলো যে কহতব্য নয়।'

'হাঁসেরা গাল দিল আপনাকে? আরে মশাই, হাঁসকেই তো লোকে গাল দেয়। আমার বোন পুতুল এমন চমৎকার ডাক রোস্ট রাঁধে যে কী বলব! গালে দিলে হাতে স্বর্গ পাই।'

'সে যাই বলুন। হর্ষবর্ধনবাবুর হাঁসগুলো তেমন উপাদেয় নয়। বিলকুল বিষতুল্য! আমাকে দেখেই না তারা কোয়াক্ কোয়াক্ বলে এমন গাল পাড়তে শুরু করল যে...' বলতে বলতে তিনি রাঙা হয়ে উঠলেন,....'কেন, আমি... আমি কি কোয়াক? আমি কি হাতুড়ে ডাক্তার নাকি? লোকে বললেই হোলো?'

'ও! এই কথা!' আমি ওঁকে আশ্বাস দিই: 'না মশাই না,

হাঁসগুলো আপনার কোনো গুপ্ত কথা ফাঁস করেনি, এমনিই ওরা হাঁসফাঁস করছিল। হর্ষবর্ধনবাবুর ওগুলো বিলিতি হাঁস কিনা, তাই ওরা ওইরকম ইংরেজী ভাষায় কথা বলে ; ইংরেজীতে কোয়াক্ বলতে যা বোঝায় তা ঠিক ওর অর্থ নয়, বাঙালী হাঁস হলে ওই কথাটার মানে, হতো ·· মানে, বঙ্গভাষার ওর অনুবাদ করলে হবে—প্যাঁক প্যাঁক।'

'প্যাঁক প্যাঁক ? ঠিক বলছেন ? তাহলে আর কোনো কথা নেই। চলুন তবে।'

বলে তিনি রাজী হলেন যেতে। 'দাঁড়ান, আমার ব্যাগটা গুছিয়ে নিই আগে।···এই ব্যাগ নিয়েই হয়েছে আমার যতো হাঙ্গামা। এটাকে বাগে আনাই দায়! একেক সময় এমন মুশকিলে পড়তে হয় মশাই····!'

'ব্যাগাড়ম্বর বেশি না করে···' আমি বলতে যাই, বাধা দিয়ে তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন,—'বাগাড়ম্বর ? বৃথা বাগাড়ম্বর করছি আমি ?'

'না না, সে কথা বলছি না। বলছিলাম যে—'

'কী বলছিলেন ?'

'বলছিলাম, একটু ব্যগ্র হবেন দয়া করে। রোগিণীর অবস্থা ভারি কাহিল কিনা।'

'ব্যগ্রই হচ্ছি তো। ব্যাগ না হলে কি করে ব্যগ্র হই ? এই ব্যাগের মধ্যেই তো আমার থার্মোমিটার, স্টেথিস্কোপ, রক্তচাপ মাপার যন্তর, ওষুধপত্তর যাবতীয় কিছু !'

বলে সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে সব্যাগ হয়ে তিনি সবেগে আমার সাথে বেরিয়ে পড়লেন····

কিন্তু এক কদম না যেতেই তিনি থমকে দাঁড়ালেন একদম। পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে বকতে লাগলেন আমায় ঃ

'নাঃ, আমি যাব না। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে। আপনার ঐ কোয়াক্ কোয়াকই হোক আর প্যাঁক প্যাঁকই হোক, ওই

হাঁসরা থাকতে ও-বাড়িতে আমি পা দেব না প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। আমার শপথ আমি ভাঙতে পারব না। মাপ করবেন আমায়।'

বলে তিনি বেঁকে দাঁড়ালেন।

এবং আর দাঁড়ালেন না। তারপর আর না এঁকে বেঁকে সোজা তিনি এগুলেন নিজের বাড়ির দিকে।

রাম ডাক্তার এমন অবুঝ, সত্যি!

অগত্যা, কী আর করা? সব গিয়ে খোলসা করে বললাম হর্ষবর্ধনকে। বললাম যে 'বউকে যদি বাঁচাতে চান তো বিদেয় করে দিন আপনার হাঁসদের।'

শুনে হর্ষবর্ধন খানিকক্ষণ গুম হয়ে কী যেন ভাবলেন। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন :

'কা তব কান্তা কস্তে পুত্র! দারা পুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার!...এ দুনিয়ায় কে কার?...হাঁস কি আমার? হাঁসের কি আমি? হাঁস কি আমার সঙ্গে যাবে? হাঁস নিয়ে কেউ আসে না, যদিও সবাই হাঁসফাঁস করে মরে। হাঁস নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাবো? যাক্ গে হাঁস।...রাখে রাম মারে কে? মারে রাম রাখে কে?....কার হাঁস কে পোষে।' বলতে বলতে তিনি যেন পরমহংসের পরিহাস হয়ে উঠলেন : 'টাকা মাটি, মাটি টাকা...যাক্-গে হাঁস। যেতে দাও। বিস্তর টাকায় কেনা হাঁসগুলো। বহুৎ টাকা মাটি হোলো, এই যা।'

বলে খানিকক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে কী যেন ভাবলেন, তারপর ককিয়ে উঠলেন আবার—'নাঃ, বৌকে আমি হাসপাতালে পাঠাতে পারব না। তার চেয়ে হাঁসগুলোই বরং রসাতলে যাক্।'

তারপর গিয়ে তিনি পোলট্রির আগল খুলে দিয়ে খেদিয়ে দিলেন হাঁসদের। পাড়ার ছেলেদের সমবেত উল্লাসের মধ্যে তারা ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে চলে গেল...

হংস-বিদায়ের খবরটা চেম্বারে গিয়ে জানাতে তারপরে ব্যাগ হস্তে ব্যগ্র হয়ে বেরুলেন আবার রাম ডাক্তার।

এলেন রাম ডাক্তার।

আসতেই হর্ষবর্ধন তাঁর হাতে ভিজিট হিসেবে করকরে দুখানা একশ' টাকার নোট ধরে দিয়ে তাঁকে নিয়ে গৃহিণীর ঘরে গেলেন। আমরাও গেলাম সাথে সাথে।

'কী কষ্ট হচ্ছে আপনার বলুন তো?' রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে শুধালেন রাম ডাক্তার।

'মাথা টনটন করছে, দাঁত কনকন করছে, গা শিরশির করছে, তার ওপর পেট কামড়াচ্ছে আবার।' জানালেন গিন্নী।

'বটে?' বলে রাম ডাক্তার মুখ ভার করে কী যেন ভাবলেন খানিক, তারপরে হর্ষবর্ধনকে টেনে নিয়ে বাইরে এলেন।

'কেস খুব কঠিন মনে হচ্ছে আমার।' গম্ভীর মুখ করে বললেন রাম ডাক্তার।

'বউ আমার বাঁচবে তো?' হর্ষবর্ধন আতঙ্কিত হন।

'না না, ভয়ের কোনো কারণ নেই। এক্ষেত্রে তেমন মারাত্মক কিছু ঘটবার আশঙ্কা করিনে। তবে এসব রোগে সাধারণতঃ দশজন রোগীর ন'জনাই মারা যায়। একজন মাত্র বাঁচে কেবল।'

'তাহলে?' হর্ষবর্ধনের আতঙ্ক এবার আরো যেন দশগুণ বেড়ে যায়।

'অ্যাঁ, বলেন কি মশাই? তবে তো বউদির বাঁচানোর আর কোনই আশা নাই।' গোবরা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে। বলে কাঁদতে থাকে।

'ইনি বাঁচবেন।' ভরসা দেন ডাক্তারবাবু: 'এর আগে এই রোগে ন'জন আমার হাতে মারা গেছে। ইনিই দশম। এঁকে মারে কে।...যাক্, আপনারা আমায় রুগীকে দেখতে দিন তো দয়া করে এবার। ভালো করে পরীক্ষা করে দেখি আগে, বাইরে গিয়ে

অপেক্ষা করুন আপনারা। রুগীর ঘরে কেউ আসবেন না যেন এখন।' বলে আমাদের ভাগিয়ে দিয়ে তিনি ভেতরে রইলেন।

আমরা তিনজন পাশের ঘরে এসে বসলাম। হর্ষবর্ধনের মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আর গোব্‌রার মুখ শুকিয়ে হয়েছে ঠিক নারকোলের ছোবড়ার মতই।

'মাথা টনটন, দাঁত কন্‌কন, পেট চনচন—শক্ত অসুখ বই কি!' —আমি বলি। আবহাওয়ার গুমোটটা কাটাবার জন্যই একটা কথা ব'লি আমি মোটের ওপর—সেই গুমোটের ওপর।—'এর একটা হলেই রক্ষে নেই একসঙ্গে তিন তিনটে।'

'ব্যামোটা বউদির শিরা উপশিরায় ছড়িয়ে পড়েছে দাদা।' গোব্‌রা মন্তব্য করে: সারা গা শির শির করছে, বলল না বৌদি?

'শীরঃপীড়াই হয়েছে তো।' আমিও একটু ডাক্তারি বিদ্যা ফলাই। 'মাথা টনটন করছে বললেন না?'

রাম ডাক্তার দরজার গোড়ায় দাঁড়ালেন এসে—'উকো দিতে পারেন একটা আমায়? নিদেন একটা ছেনি?'

হর্ষবর্ধন একটা উকো এনে দিলেন। ছেনিও।

'উকো দিয়ে কী করবে দাদা? বউদির মাথায় উকুন হয়েছে নাকি? গোব্‌রা শুধোয়: 'উকো ঘষে ঘষে উকুনগুলো মারবে বলে বোধ হচ্ছে।'

'হতে পারে!' আমার সায় তার কথায়।—'তারাই হয়ত মাথায় কামড়াচ্ছে, সেইজন্যেই এই শিরঃপীড়াটা হয়েচে বোধ হয়।'

হর্ষবর্ধন চুপ করে বসে রইলেন মাথায় হাত দিয়ে।

'কিম্বা দাঁতের জন্যেও লাগতে পারে উকো।' আমার পুনরুক্তি: দাঁতে কেরিজ হয়ে থাকলে তাতেও দাঁতের যন্ত্রণা হয়। উকো দিয়ে ঘষেই সেই কেরিজ তুলবেন হয়ত উনি। দাঁত নেহাত ফ্যালনা জিনিস না মশাই। দাঁত ফেলবার পর তবেই দাঁতের মর্যাদা বুঝতে পারে মানুষ। খারাপ দাঁত থেকে হাজার ব্যাধি আসে। মাথা ব্যথা.

পেট ব্যথা, বুকের ব্যামো, হজমের গোলমাল, এমনকি বাতের দোষও আসতে পারে ঐ দাঁতের দোষ থেকে।'

রাম ডাক্তার আবার এসে উঁকি মারলেন দরজায়ঃ

'হাতুড়ি কিম্বা বাটালি জাতীয় কিছু আছে আপনাদের কাছে?'

হর্ষবর্ধন হাতুড়ি এনে ডাক্তারের হাতে তুলে দেন।

'হাতুড়ি নিয়ে কী করবে দাদা?' আঁতকে ওঠে গোব্‌রাঃ 'দাঁতের গোড়ায় ঠুকবে নাকি গো? দাঁতের ব্যথা সারাতে দাঁতগুলোই সব তুলে না ফ্যালে বউদির?

'কী জানি ভাই।' দীর্ঘনিশ্বাস ফ্যালেন দাদাঃ লোকে রাম ডাক্তারকে কেন যে হাতুড়ে বলে থাকে কে জানে।

'তার মানে তো পাওয়া যাচ্ছে হাতে হাতেই...' গোব্‌রা হাতুড়ির সঙ্গে হাতুড়ের একটা যোগসূত্র স্থাপন করতে চায়।

'দাঁত না হয়ে মাথাতেও পিটতে পারে হাতুড়ি....বাধা দিয়ে আমি বলিঃ 'শক্‌ট্রীটমেণ্ট বলে একটা জিনিস আছে না?'...

'দাদার শখ যেমন। আপনার মতন হাতুড়ে লেখকের পরামর্শ শুনে হাতুড়ে ডাক্তার এনে নিজের শখ মেটান উনি এবার।' গোব্‌রা আমার কথার ওপর কথা কয়। বউদির মধুর হাসি আর দেখতে হচ্ছে না দাদাকে—এ জন্মে নয়। হায় হায়, এই ফোক্‌লা বউদি ছিল আমার বরাতে শেষটায়— কী করব তার। সে হায় হায় করতে থাকে।

'মাথায় হাতুড়ি ঠুকলে শিরঃপীড়া সারে বলে শুনেছি।' তবুও আমি ভরসা দিয়ে বলতে যাই।

'মাথা না থাকলে তো মাথাব্যথাই থাকে না মশাই।' হর্ষবর্ধন বলেন 'শকট্রীটমেণ্ট মানে হচ্ছে হটাৎ একটা ঘা মেরে শক দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রোগ সারিয়ে দেওয়া। শক্ত রোগ যা তা নাকি সব তাতেই সেরে যায়।' আমার বক্তব্য রাখিঃ 'রাম ডাক্তারের কোনো কসুর নেই মশাই! যথাশক্তি করছে বেচারা।' 'তা যদি হয় তো আমার বলার কিছু নেইকো' হাল ছেড়ে দেন হর্ষবর্ধন। 'যথাসাধ্য করতে

দিন ডাক্তারকে, বাধা দেবেন না আপনারা।' আমার কথাটির শেষে পুনশ্চ যোগ করি।

'একটা করাত দিতে পারেন আমায়? ছোটখাট হলেও চলবে।' দরজার সামনে আবার রাম ডাক্তারের আবির্ভাব। হর্ষবর্ধনের কাঠ চেরাই করাতী কারখানায় করাতের অভাব ছিল না। এনে দিলেন একখানা। তারপরে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন তিনি—'কী সর্বনাশ হবে কে জানে!'

'বউদির পেট কেটে ছেলেটাকে বার করবে বোধ হচ্ছে।' গোবর্ধন পরিষ্কার করে: 'বউদি কাটা পড়বে আর ছেলেটা মারা পড়বে; ডাক্তারের করাতে, আমাদের বরাতে এই ছিল, যা বুঝতে পারছি!'
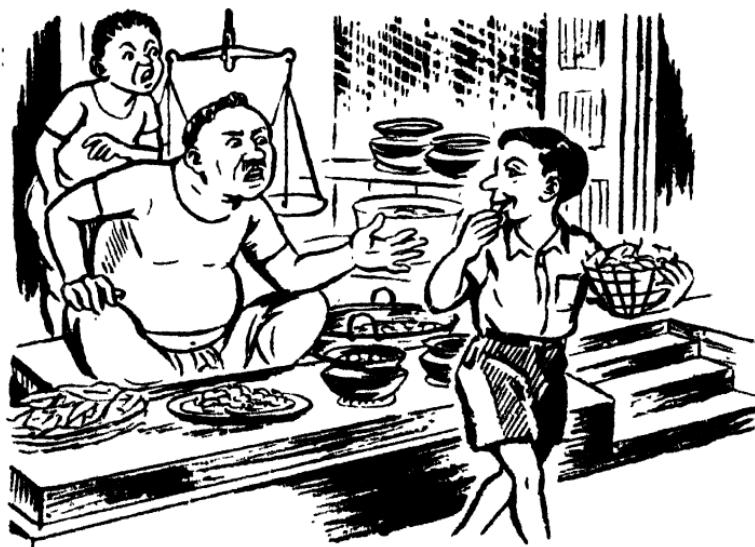
'ছেলেটা যায় যাক্, আমার বউ বাঁচলে বাঁচি।'

'বেঁচে যাবে আপনার বউ।' আমি তাঁকে ভরসা দিই: 'বড়ো বড়ো যাদুকর দেখেননি, করাত দিয়ে একটা মেয়েকে দু-আধখানা করে কেটে ফ্যালে, তারপর সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে দেয় আবার, দ্যাখেননি কি? কেন, আমাদের পি, সি, সরকারের ম্যাজিকেই তো তা দেখা যায়! তেমনি ভেলকি দেখাতে পারেন বড় বড় ডাক্তাররাও। তাঁরাও কেটে জোড়া দিতে পারেন।'

কিন্তু হর্ষবর্ধন আর চুপ করে বসে থাকতে পারেন না, লাফিয়ে ওঠেন হঠাৎ—'আমার চোখের সামনে বউটাকে করাতচেরা করবে আর আমি বসে বসে তাই দেখব! লোকটা পেয়েছে কি?' বলে তিনি ঝড়ের বেগে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন। গোবর্ধনও সাথে সাথে যায়। চকরবরতি আমিও তাঁদের পশ্চাদ্বর্তী হই।

'কী পেয়েছেন আপনি?' ঝাঁঝিয়ে ওঠেন তিনি ডাক্তারকে: 'করাত দিয়ে আমার বউকে কাটবেন যে? কেটে দু টুকরো করবেন আপনি? কেন? কেন? যতই কাঠের ব্যবসা করি মশাই, এতটা আকাঠ হইনি এখনো। কেন কী হয়েছে আমার বউয়ের— যে করাত দিয়ে তার....'

'কিসের বউ!' বাধা দেন রাম ডাক্তার: আমি পড়েছি আমার ব্যাগ নিয়ে। বউকে আপনার দেখলাম কোথায়? হতভাগা ব্যাগটা একেক সময় এমন বিগড়ে যায়! হাতুড়ি পিটে, ছেনি দিয়ে, উকো ঘষে কিছুতেই এটাকে খুলতে পারছি না। করাত দিয়ে কাটতে লেগেছি এবার। এর মধ্যেই তো আমার যত যন্তরপাতি ওষুধপত্র, এমনকি থার্মোমিটারটি পর্যন্ত! আগে এসব বার করলে তবে তো দেখব আপনার বউকে! রাজ্যের রোগ সারাই আমি, কিন্তু নিজের ব্যাগ সারাতে পারি না। এই ব্যাগটাই হয়েছে আমার ব্যায়রাম!

॥ হর্ষবর্ধনের ওপর টেক্কা ॥

হর্ষবর্ধনের বাড়ি চেতলায়। বাড়ির পেছনের ফাঁকা জায়গাটা ঘিরে করাত দিয়ে কাঠ-চেরার এক কারখানা তিনি বানিয়েছেন। তাঁর আপিস ঘর বাড়ির একতলায়।

হর্ষবর্ধন একদিন আপিসে বসে আছেন, হিসাব দেখছেন কারবারের। এমন সময়ে একটা লোক তাঁর দরবারে এসে দাঁড়ালো। নিজের এক দরবার নিয়ে বলল, 'বাবু' আপনার বাড়ির সামনের অতবড় রোয়াকটা তো একদম ফাঁকা পড়ে থাকে, ওখানে আমায় মেঠায়ের দোকান খুলতে দেননা একটা!'

'কিসের মেঠাই' হর্ষবর্ধন শুধোন।

'এই সন্দেশ, দরবেশ, রসগোল্লা, জিলিপি, পান্তুয়া, বোঁদে, খাজা, গজা, মিহিদানা, মতিচুর, দই, রাবড়ি,...' বলে যায় লোকটা।

হর্ষবর্ধন হাঁ করে শোনেন। শুনতে শুনতে তাঁর হাঁ যেন আরো বড়ো হয়ে ওঠে'—'সন্দেশ · দরবেশ...। সন্দেশের দর যে বেশ তা আমার জানা আছে ভালোই তিনি বলেন।

'আবার খাবো', দেদার খাবো,........হরেক রকমের মেঠাই বানাবো আমরা।' জানায় লোকটা।

'আবার খাবো আমরা দেদার খেয়েছি।' ঘাড় নাড়েন হর্ষবর্ধন : 'ভীমনাগের দোকানের।'

'আবার খাবেন এখানে। আবার খাবোর পরে আরো আছে—দেদার খাবো, আমাদের নিজেদের বানানো। আনকোরা নিজস্ব পেটেন্ট।' লোকটি প্রকাশ করে: 'দেদার খেতে হবে—এমনি খাসা মেঠাই মশাই!'

'বাঃ বাঃ! সে তো খুব ভালো কথা।' বলে হর্ষবর্ধনের খট্‌কা লাগে—'প্রত্যেক খাবারটাই তো পেটেন্ট। পেটে দেবার জন্যেই তো সব। তাই নাকি!....তাহলে!'

হর্ষবর্ধনের উৎসাহ দেখে উৎসাহিত হয়ে লোকটি বলে: 'পেটেন্ট মানে পেটে না দিয়ে রক্ষে নেই। তা বাবু, দোকান ঘরের জন্যে আমরা কোনো—সেলামি টেলামি দিতে পারবো না কিন্তু। এধারে দোকান ঘরের দরুণ সবাই সেলামি চায়—পাঁচ দশ হাজার টাকা। অত টাকা আমরা কোথায় পাব বাবু? তাই আপনার ফ্যাবরট

এলাম। সেলামি দেবনা, তবে ভাড়া দেব যা ন্যায্য হয়। আর সেলামির বদলি আপনাকে সন্দেশ খাওয়াবো রোজ রোজ—তার কোন দাম লাগবে না আপনার।'

'তোমাকে কোন ভাড়াও দিতে হবে না তাহলে।' হর্ষবর্ধন সঙ্গে সঙ্গে তার আর্জি মঞ্জুর করেন : 'আমার রোয়াক তো ফাঁকাই পড়ে আছে অমনি। তোমার কাজে যদি লেগে যায় তো মন্দ কি।'

'কাঠের তক্তা দিয়ে ঘিরে ঘরের মতন করে দোকান বানিয়ে নেব আমরা নিজের খরচায়। আর সেই দোকান ঘরে আমি আর আমার ছেলে মাথা গুঁজে পড়ে থাকব। আমি আর ছোটকু দুজনতো' লোক মোট আমরা।'

'আমার বাড়ির পিছনে কাঠের কারখানায় তুমি তক্তাও পাবে—যত চাও। এনতার নাও আর বানাও তোমার দোকান। তক্তারও কোন দাম দিতে হবে না তোমাকে।'

ব্যাস্, বসে গেল মেঠাইএর দোকান। হর্ষবর্ধনের আপিস ঘর সন্দেশের গন্ধে ভুরভুর করতে লাগল। আর তিনি সেই গন্ধে মাত হয়ে আরাম কেদারায় কাত হয়ে আবার খাবো দেদার খেতে লাগলেন। দেদারখাবোও খেলেন আবার—আবার।

অসন্তোষ প্রকাশ করলো গোবর্ধন।—'দাদা, তুমি এসব কী বাধালে বল দেখি?

'কেন, কী বাধালাম?' শুধালেন দাদা।

'এই রোয়াক জোড়া মেঠায়ের কারবার। পেছনে তো কাঠের কারখানা বাধিয়েছই। এবার সামনেও একটা কাণ্ড বাধাও। কাণ্ড কারখানা কোনটারই তুমি বাকী রাখলে না।

'কাণ্ড না বলে প্রকাণ্ড বল। কতো বড়ো বড়ো সন্দেশ বানায় দেখেছিস? এক একটার দাম নাকি আট আট আনা।

'রোয়াকে বসে পাড়ার ছেলেদের ড্যাংগুলি খেলা দেখতাম

তাতেও তুমি বাগড়া দিলে শেষটায়। ফোঁস ফোঁস করে গোব্‌রা।

'আপসোস করিসনে। ডাণ্ডাগুলি চোখে দেখার চেয়ে সন্দেশ গুলি চেখে দেখা ঢের ভালোরে। যত খুসি খা না সন্দেশ—পয়সা লাগবে না তোর। আমাদের জন্যে বড়ো করে স্পেশাল সাইজের বানায় আবার।'

'খাবো কেন অমনি? খেতে যাবো কেন? আমাদের কি কিনে খাবার পয়সা নেই নাকি? আমরা কি গরীব? পরের মিষ্টি খাবো কেন অমনি অমনি?'

'মিষ্টি তো পরের থেকেই খেতে হয়রে বোকা। যে মিষ্টিই বল না, পরের পেলে, পরের খেলে মিষ্টি লাগে আরো—যদি তা অমনি মেলে আবার। দেখিস না খেয়ে তুই একদিন। তা যদি না হবে তো বড়লোকেরা—নেমতন্ন বাড়ি গিয়ে গণ্ডে পিণ্ডে গিলে আসে কেন বল তো? তাদের কি পয়সার অভাব? বাড়িতে কি খেতে পায়না নাকি?'

'অমনি অমনি পরের মিষ্টি খাবো তাই বলে? দাদা, তুমি চেতলায় এসে ভারী হীনচেতা হয়ে পড়েছ দেখছি!'

'অমনি কিসের। ভাড়ার বদলি তো।' দাদা জানান: 'ওইটুকুন রোয়াক-এর ভাড়া হত নাকি মাসে তিনশ টাকা আর সেলামি অন্ততঃ তিন হাজার—লোকটাই বলেছে আমায়। তার বদলেই দিচ্ছে তো। ওই যে ভারা ভারা সন্দেশ দেয়, আসলে তা হচ্ছে দোকানের বদলে ওর সন্দেশের ভাড়া।'

এমন সময় দোকানদার প্রকাণ্ড এক রেকাব ভরতি সন্দেশ এনে দুজনের সামনে রাখল—'আমার একটা আর্জি ছিল কর্তা।'

হর্ষবর্ধন একটা সন্দেশ মুখে পুরে দিয়ে কান খাড়া করলেন—'শুনি তোমার আর্জি।'

'আমার ভাইঝির বিয়ের—দিন দুয়ের জন্যে দেশে যেতে হবে। কাছেপিটেই—এই হাওড়াতেই বিয়ে। বেশী দূর না। আমার

ছেলে আর আমি দুজনাই যাব—এই সময়টা আমার দোকানটা দেখাশোনার ভার কার ওপর দিয়ে যাই তারই একটা পরামর্শ নেবার ছিল আপনার কাছে।

'কেবল চোখে দেখার ভার হলে নিতে পারতুম আমরা। হর্ষবর্ধন বলেন—কিন্তু—কিন্তু -' একটু কিন্তু কিন্তু হয়েই থামতে হল তাঁকে। 'আজ্ঞে সেই ভারই তো নিতে বলছি আপনাদের—ওই চোখে দেখার ভার। চাখবেন বই কি, হরদমই চাখবেন! যখন খুসি তখনই, সেই সঙ্গে দোকানটায় বসে একটু চোখে দেখতেও হবে, চোখও রাখতে হবে তার ওপর।

'চোখ রাখতে হবে। কার ওপর? মেঠাই মণ্ডার ওপরেই তো? গোবর্ধনের প্রশ্ন।

হর্ষবর্ধন বলেন, 'সে আর এমন শক্ত কি। মেঠাই মণ্ডা সামনে থাকলে নজর কি আর অন্যদিকে যায় কারো ভাই?'

'আজ্ঞে, নজর রাখতে হবে পাড়ার ছোঁড়াদের ওপরেই।' জানায় দোকানী: 'তারা বড় সহজ পাত্র নয় মশাই।'

'তা আপনার ছেলেকেই দোকানে বসিয়ে রেখে যান না? বিয়ে বাড়িতে গিয়ে সে আর করবেটা কি। ছেলেরাই ভালো নজর রাখতে পারে ছেলেদের ওপর।' গোবর্ধন বাতলায়।

'ছোটকা থাকবে দোকানে? তাহলেই হয়েছে। এই দুদিনেই আমার দোকান ফাঁক হয়ে যাবে মশাই। সেই জন্যেই তো আরো ওকে এখানে না রেখে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। ওর যা এক একজন বন্ধু আছে জানেন, দেখতেন যদি, ঘোঁৎকা হোৎকা, কোঁৎকা—কী সব নাম যেন। কিন্তু এক একটি চীজ ভারী ইতর তারা। ও তাদের লুকিয়ে লুকিয়ে সন্দেশ খাওয়ায় রোজ।'

ছোটকা বাবার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল সব, প্রতিবাদ করতে যায়, কিন্তু বাধা পায় হর্ষবর্ধনের কথায়—

'তা ইতর লোকদের জন্যেই তো মেঠাই মণ্ডা মশাই। শাস্ত্রে

তো বলেই দিয়েছে মিষ্টান্নমিতরে জনা। অর্থাৎ কিনা, মিষ্টান্নম্‌... ইতরে জনা....'

ছেলেটি বলে ওঠে: 'মোটেই তারা ইতর নয় বাবু। তারা আমার বন্ধু সব। শোনো বাবা, বাবুর মুখেই শোনো—তোমার শাস্তরে কী বলছে—শোনো ওঁর মুখে। মিষ্টান্ন—মিতরে—জনা। মানে কিনা, তোমার মিতাদের জন্যেই যত মিষ্টি। তাদের তুমি খুব কসে মিষ্টি খাওয়াও। মিতা মানেই মিত্র। আর, মিত্র আর বন্ধু এক কথা—তাই নয় কি বাবু?

গোবরা সায় দেয়—'ঠিক কথা, যাকে বলে মিতা, তাকেই বলে মিত্র, তাকেই বলে বন্ধু, ইংরেজিতে আবার তাকেই বলে ফেরেণ্ডো।'

'ওর ফেরেণ্ডোদের ঠ্যালাতেই আমায় ভেরেণ্ডা ভাজতে হবে—মেঠাইয়ের দোকান তুলে দিতে হবে। হয়তো পাট তুলতেও হবে না, আপনিই উঠে যাবে দোকান। ছোটকাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ওর ঘাড় ভেঙে বজ্জাতগুলো রোজ রোজ যা রসগোল্লা পান্তুয়া সাবাড় করে যায়—কী বলব বাবু!'

'তা বেশতো। দুদিনের জন্যেই যাচ্ছেন তো।' গোবর্ধনের বুঝি সহানুভূতি জাগে—'এই দুদিন না হয় আমিই দেখব আপনার দোকান। এমন আর কি শক্ত কাজ। রসগোল্লার দাম দু আনা, সন্দেশের দাম ঐ, পান্তুয়ার দাম ঐ। নগদ দাম নিয়ে বেচতে হবে—এই তো ব্যাপার। তা এ আর এমন শক্ত কি?'

'সেই সঙ্গে আবার একটু নজরও রাখতে হবে যে।' মনে করিয়ে দেয় মেঠাইওলা।

'ঐ তিনজনের ওপরেই তো। কী বললেন—হোঁৎকা, ঘোঁৎকা আর কোঁৎকা—তাই না? অবশ্যি, আমি চিনি না তাদের কাউকে, তবে নামেই বেশ মালুম হচ্ছে। হোঁৎকা চেহারার কেউ এলে তাকে আর ঘেঁষতে দেব না দোকানে—সেইটাই হোঁৎকা হবে নিশ্চয়। আর ঘোঁৎকা নিশ্চয় ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে আসবে—নইলে ওর

নাম ওরকমটা হল কেন? ওর আওয়াজেই টের পাওয়া যাবে। আর কোঁৎকা যদি আমার ত্রিসীমানায় আসে—আমাকে ঠাকানোর চেষ্টা করে যদি—এইসা এক কোঁৎকা লাগাব ওকে যে নিজের নাম ভুলে যাবে বাছাধন।'

'ব্যাস। তাহলেই হবে।' হাসিখুশির প্রচ্ছদ হয়ে উঠলো দোকানদার—'কাল দুপুরের গাড়িতে যাচ্ছি আমরা। আপনি দুপুর থেকেই বসবেন তাহলে। কাল আর পরশুটা কেবল। তার পরদিন ভোরেই আমরা ফিরে আসছি।'

—'কিন্তু—কিন্তু—' এবার গোব্‌রা একটু কিন্তু কিন্তু করে—'দেখুন মেঠাই খেতে জানি, বেচতেও পারি হয়তো, কিন্তু বানাতে জানিনা যে সেটার কী হবে?'

'দুদিনের মতন সন্দেশ রসগোল্লা আর পান্তুয়া বানিয়ে রেখে গেলাম। এক কড়াই পান্তুয়া, এক হাঁড়ি রসগোল্লা আর এক খোরা সন্দেশ।'

'বেশ! বেশ! তাহলেই হল। আমার কাজ তো এই দুদিন চোখে দেখা কেবল! তা আমি পারবো খুব। তবে আমার চেখে দেখাটা তেমন হবে না হয়তো। দাদার মতন আমার তেমন হজমশক্তি নেইতো বাপু!'

'তাহলে দয়া করে আপনিই বসবেন বাবু!' অনুনয় করল দোকান-দার—হয়তো বা হর্ষবর্ধনের প্রতি একটু কটাক্ষ করেই মনে হয়।

পরদিন দুপুরে দোকানে বসেছে গোবর্ধন। খদ্দেরের তেমন ভীড় থাকেনা দুপুর বেলাটায়—বেচাকেনার হাঙ্গামা কম। মাঝে মাঝে অবশ্যি দু একজন আসছিল বটে, একটা জিলিপি কি একটু বোঁদে কিনতে দুচার পয়সার। কিন্তু দু আনার নীচেয় কোনো খাবার তৈরি নেই জেনে ফিরে যাচ্ছিল আবার।

খানিক বাদে একটা ছেলে এসে দাঁড়ালো দোকানের সামনে। গোবর্ধনকে সেখানে বসে থাকতে দেখে ছেলেটি যেন একটু থতমত

খেয়েছে বলে মনে হল গোবরার।—'কী চাইছে তোমার?' তাকে জিজ্ঞেস করেছে সে।

'পান্তুয়া খেতে এলাম।' সোজা বলল ছেলেটা।

'পান্তুয়া খেতে এলে! তার মানে?'

'পান্তুয়া খাই যে! রোজই খাইতো।' ছেলেটি জানায়।

'রোজই খাও, বটে; তোমার নাম কি হোংকা নাকি গো?'

'কেন হোঁৎকা হতে যাবে কেন; পান্তুয়া খেলে কি কেউ হোঁৎকা হয় নাকি?' ছেলেটি যেন অবাক হয় একটু।

'না, তা কেন হবে। এমনি শুধোচ্ছিলাম'—জানায় গোবরা।

হোঁৎকা-কথিত ছেলেটির তবুও যেন আপত্তির কারণ যায় না।—'হোঁৎকা-পনাটা কোথায় দেখলেন আমার শুনি?'

'তা বটে। ফড়িংয়ের মতই টিঙটিঙে— হোঁৎকা তোমাকে বলা যায়না বটে। তবে কি তুমি কোঁৎকা?'

'রামো! কোঁৎকা আমার চৌদ্দপুরুষের কেউ নয়।'

'তবে তোমার নামটা কি জানতে পারি একবার?'

'আমার নাম মশা। বুঝলেন মশাই।'

'মশা! অদ্ভুত নাম তো।' গোবর্ধন অবাক হয়—'এ রকম তো কখনো শুনিনি ভাই। তা, এমন নাম হবার কারণ?'

'শুনেছি আমি নাকি ছোটবেলায় মশার মতন পিনপিন করে কাঁদতাম তাই আমার ওই নাম হয়েছে।

'তা হতে পারে।' গোবর্ধন ঘাড় নাড়ে: 'তা পান্তুয়া খাবে যে, পয়সা এনেছ সঙ্গে?'

'পয়সা কিসের? আমিতো অমনি খাই। রোজ রোজই খেয়ে থাকি।

'না, অমনি খাওয়া চলবে না বাপু। পয়সা দিতে হবে, দাম লাগবে তোমার খাওয়ার।'

'বারে, মালিকের ছেলের সঙ্গে ভাব আছে পয়সা লাগে না আমার। শুধান না দোকানের মালিককে!'

'মালিক নেই—সে হাওড়া গেছে তার ভাইঝির বিয়েয়।'

'মালিক হাওয়া হয়ে গেছে? কী বললেন, অ্যাঁ?'

'হাওয়া নয় হাওড়ায় গেছে। ভাইঝির বিয়ে দিতে।'

'বেশ তো, তাঁর বদলি যিনি রয়েছেন, তাঁকেই শুধোন না কেন। একজন তো আছেন তাঁর জায়গায়। আপনি তো দোকানের কর্মচারী—আপনি তার কী জানবেন। আমি এই পান্তুয়া খেতে বসলাম—যেমন খাই রোজ।' বলে সে পান্তুয়ার কড়াইয়ের কাছে বসে গেল ধপ্ করে।

'দাদা, ও দাদা।' হাঁক পাড়লো গোব্‌রা—'মশায় পান্তুয়া খাচ্ছে। পান্তুয়া খেয়ে যাচ্ছে।'

'মশায় পান্তুয়া খাচ্ছে। কী যে বলিস তুই।'

ভেতরের অপিস ঘর থেকে সাড়া এলো দাদার।

'বসে গেছে পান্তুয়ার কড়ায়'। গোব্‌রা জানায়।

'বসুক গে। মশা আর কত খাবে।' দাদা জবাব দিলেন—'রসেই লেপটে যাবে। পান্তুয়ার গায়ে আর হুল বসাতে হবে না বাছাধনকে।'

'দেখলেন তো, কী বলল নতুন মালিক?' বলে ছেলেটা টপা টপ মুখে পুরতে লাগল—আর দ্বিতীয় কথাটি না বলে।

হাঁ করে দেখতে লাগলো গোবর্ধন। তার চোখের ওপর আধখানা কড়াই ফাঁক হয়ে গেল দেখতে না দেখতে। খেয়ে দেয়ে সে চলে যাবার খানিক বাদে আরেকটি ছেলে এলো সেখানে।

'তুমি আবার কে বটে হে?' শুধালো গোব্‌রা: 'হোংকা ফোঁতকাদের কেউ নয় তো?'

'আজ্ঞে না। আমি দোকানদারের আপনার লোক। তার মাস্তুতো ছেলে!'

'মাস্তুতো ছেলে! তা হয় নাকি আবার? কখনো তো শুনিনি। এমনটা কোন কালে হয়েছে বলে তো জানি না।'

'শোনেননি তো দেখুন এখন। মাস্তুতো ছেলে মানে, তার ছেলের মাস্তুতো ভাই। বুঝলেন এবার?'

'বুঝেছি। তা নামটা কি তোমার শুনি একবার?'

'আজ্ঞে, আমার নাম মাছি। আপনার রসগোল্লা খেতে এসেছি। রোজ রোজ আমি খাই এখানে এসে।' এই না বলে রসগোল্লার হাঁড়িটা টেনে নিলে সে।

'দাদা ও দাদা।' আবার হাঁক পাড়লো গোব্‌রা—'এবার মাছি এসে বসেছে তোমার রসগোল্লার হাঁড়িতে।'

আপিস ঘর থেকে এবার রাগত গলা শোনা গেল দাদার—'তুই কি আমাকে কাজ করতে দিবি না নাকি? ইয়ারকি পেয়েছিস্‌? একটা মাছি তাড়াতে পারছিস নে? তাড়িয়ে দে—তাড়িয়ে দে—সামান্য একটা মাছিকে তাড়াতে কতক্ষণ লাগে?'

'তাড়ানো যাচ্ছে না যে।' গোব্‌রা জানায়ঃ 'মোটেই সামান্য মাছি নয়।'

'তাহলে বসতে দে মাছিকে। বলে আঁস্তাকুঁড়েতেই বসে, আর রসগোল্লা পেলে বসবে না?'

'বসুক তাহলে। খাক রসগোল্লা।' বলে হাল ছেড়ে দেয় গোব্‌রা। আস্ত এক হাঁড়ি রসগোল্লা সাবাড় করে মুখ মুছে উড়ে যায় মাছিটা।

তার খানিক বাদে হাতের কাজ সেরে দাদা এসে হাজির সেখানে। দোকানের হাল চাল দেখে তাঁর সারা মুখ আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠল। 'বাঃ, খাসা চালিয়েছিস তো দোকান।' বাহবা দিলেন তিনি গোব্‌রাকে—'অর্ধেক মালতো এর মধ্যেই বেচে ফেলেছিস দেখছি।'

'বেচতে আর পারলাম কই? মশা মাছিতেই সাবড়ে দিয়ে গেল সব।'

'কী বললি? মশা মাছিতে সাবাড় করে দিয়ে গেল খাবার? বলছিস কিরে?'

'তবে আর বলছিলাম কি—এতক্ষণ হেঁকে হেঁকে তোমায়? তা তুমি তো কানই দিলে না। গেরাজ্জিই করলে না আমার কথা।'

'উড়ন্ত মাছি? উড়ন্ত মশা?'

'মোটেই উড়ন্ত নয় দাদা! রীতিমতন দুরন্ত। দুরন্ত মশা, দুরন্ত মাছি। দুপেয়ে সব।

'মশা মাছিদের পাল্লায় পড়ে একেবারে ল্যাজে গোবরে হয়ে গেছিস দেখছি! হর্ষবর্ধন বলেন—'এরাই সেই হোৎকা কোঁৎকার দল, তো বুঝলি রে? দাঁড়া, এবার আমি বসছি দোকানে। আর্দ্ধেক খেয়ে গেলেও আর্দ্ধেক পড়ে আছে এখনো। নগদ দামে এটা বেচতে পারলেও লাভ না হোক, দোকানের লোকসানটা বাঁচবে অন্ততঃ।'

গোবর্ধন উঠে দাঁড়ালো। হর্ষবর্ধন বসলেন পাটিতে।

একটি ছেলে এসে পান্তুয়া চাইল এবার। গোবর্দ্ধন বলল: 'ঐ দাদা! আবার একজন এসেছে। ওদের জাত গুষ্টিই নিশ্চয়।'

'তুমি কি পিঁপড়ে নাকি হে?' জিজ্ঞেস করেন দাদা। পিঁপড়ে মানে পিপীলিকা।' সাধু ভাষায় কথাটা আরো পরিষ্কার করেন তিনি 'মানে, এখানকার বেশির ভাগ লোকই তো মশক, মক্ষিকা, আর পিপীলিকা।'

'বেশির ভাগ লোকই পিপীলিকা?'

'কেন, কথাটা কি ভুল হল নাকি? লোকদের ইংরাজিতে কী বলে শুনি? পীপল বলে না?'

'গাছকে তো বলে থাকে জানি।' ছেলেটি জানায়: 'বলে পিপুলের গাছ।'

'তা তোমার লোকেরা মশা মাছি না হোক, এখানকার বালকরা তো বটেই।' হর্ষবর্ধন ব্যাখ্যা করে দেন এবার।

'কিন্তু, আমি পিঁপড়ে হতে যাব কেন শুনি। আমি তো পান্তুয়া কিনতে এসেছি।'

'ও, পান্তুয়া কিনবে?—তা বেশ বেশ।' উৎসাহিত হন এবার হর্ষবর্ধন—'কত পান্তুয়া চাই তোমার?'

'কিলো খানেক।'

'পাঁচ টাকা দাম পড়বে কিন্তু।'

'পড়বে তো কি হয়েছে। দেব দাম।' ছেলেটি বলল: 'পান্তুয়ার কিলো পাঁচ টাকা করে – তা কে না জানে?'

'যাক্, কেনার বদভ্যেস আছে তাহলে তোমার— ভালো কথা।'

একটা বড় ভাঁড় ভর্তি কিলো খানেক পান্তুয়া ওজন করে তার হাতে তুলে দিলেন হর্ষবর্ধন—'এই নাও। দামটা দাও তো দেখি এবার।'

'না, এ পান্তুয়া আমি নেব না। কেমন যেন দেখছি পান্তুয়াটা। খাবলানো খাবলানো।' ছেলেটি বিরস মুখে ফিরিয়ে দেয় ভাঁড়।

'হ্যাঁ ভাই, যা বলেছ। একটা মশায় একটু আগে খাবলে গেছে ওগুলো।' গোবর্ধন সায় দেয় তার কথায়।

'মশায় পান্তুয়া খায়? বলছেন কি আপনি?' অবাক হয়ে ছেলেটা তারপর নিজেই সে তার কথার জবাব দেয়: 'তা খেতেও পারে মশাই। চেতলার মশার অসাধ্য কিছু নেই। শুনেছি একবার তেতলার থেকে একটা লোককে চ্যাং দোলা করে তুলে নিয়ে গেছল হাজার হাজার মশায়। তারপর তার রক্ত শুষে খেয়ে না, ছিবড়েটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে গেছল রাস্তায়। শুনেছি বটে।'

'তুমি তো শুনেছ কেবল। আমি নিজের চোখে দেখলাম।' গোবর্ধন ব্যক্ত করে।

'তাহলে ঐ পান্তুয়া আমার চাইনে। আপনারা আমায় কিলো খানেক রসগোল্লা দিন ওর বদলে। তার দামটা কত পড়বে?'

'রসগোল্লা পান্তুয়া ঐ একই দাম। ঐ পাঁচ টাকাই। দু আনা করে পিস যখন দুটোরই।'

'রসগোল্লাটা আবার মাছি বসা নয়তো মশাই?'

'ধরেছে ঠিক।' বলল গোব্রা —'মাছি বসাই বটে।'

'আপনারা মাছি বসানো রসগোল্লা দিচ্ছেন আমাকে। মাছিরা যেখানে সেখানে—যতো নোংরা জায়গায় গিয়ে বসে। যতো বীজাণু কীজাণু নিয়ে আসে। খেলে অসুখ করে। নাঃ, আপনি ওর বদলে পাঁচ টাকার সন্দেশ দিন আমায়। সন্দেশও ঐ ছ আনা করেই পিস তো?'

'হ্যাঁ।' বলে ঘাড় নেড়ে হর্ষবর্ধন তাকে খোরার থেকে চুবড়ি ভরে সন্দেশ সাজিয়ে দেন। সন্দেশের চুবড়ি নিয়ে ছেলেটি চলে যেতে উদ্যত হয়।

'ওহে দামটা দিয়ে গেলেনা?' বাধা দেয় হর্ষবর্ধন। 'আসল কাজই ভুলে যাচ্ছো যে।'

'কিসের দাম?' চুবড়ি হাতে ফিরে দাঁড়াল ছেলেটা।

'সন্দেশের দামটা?'

'সন্দেশের দাম দিতে যাব কেন? সন্দেশ তো আমি রসগোল্লার বদলে নিলাম।'

'বেশ, রসগোল্লার দামটাই দাও তাহলে।'

'রসগোল্লা তো আমি পান্তুয়ার বদলেই নিয়েছি'

'আহা পান্তুয়ার দামটাই দাও নাগো।'

'পান্তুয়ার দাম দিতে হবে কেন শুনি?' ছেলেটি ভারী বিরক্ত হয় এবার। পান্তুয়া আমি নিলাম কখন? ও তো আমি নিইনি। যা—নিলাম না, তার আবার দাম দেব কেন? যা নিইনি, তারও দাম দিতে হয় নাকি?'

ছেলেটি চলে যায় দেখে হর্ষবর্ধন তাকে ফিরে ডাক দেন আবার —'ওহে, শোনো শোনো। দাম চাচ্ছিনে, একটা কথা কেবল জানতে চাইছি। একটু আগে যারা মশা মাছির ছদ্মবেশে এসে খেয়ে গেছে, তাদের নাম কি হোঁৎকা আর···?

'আর ঘোঁৎকা। ধরেছেন ঠিক।' ছেলেটি ফিক করে হেসে ফ্যালে।

'আর তোমার নামটা?'

'আর আমি হচ্ছি কোঁৎকা।' যেতে যেতে চুবড়ির থেকে সন্দেশ

খেতে খেতে বলে যায় ছেলেটা। কোঁৎ-কোঁৎ করে গিলতে গিলতে চলে যায়। হর্ষবর্ধন হতবাক হয়ে থাকেন।

'গেছে গেছে, তার জন্য মন খারাপ কোরোনা দাদা।' গোবর্ধন সান্ত্বনা দেয় দাদাকে—'তোমাকে তো আমার মতন তেমন ল্যাজে গোবরে হতে হয়নি। তাহলেও বলতে হয় দাদা, তোমার এই কোঁৎকাটাই ভারী জবর হয়েছে। তাই না দাদা?

নিজের ল্যাজের গোবরটাই যেন দাদার মুখের উপর ভালো করে লেপে দেয় গোবরা।

'কোঁৎকা দিয়ে গেল বলছিস কিরে! কোঁৎকার ওপর আরো কোঁৎকা লাগিয়ে গেল আমায়!' হা-হুতাশ করেন দাদা: 'আধ খোরা সরেশ সন্দেশ নিয়ে গেল ছোঁড়াটা। আমার—আমার একবেলাকার খোরাক।'

॥ ঘোড়বাজি দেখলেন হর্ষবর্ধন ॥

রোববার দিন হর্ষবর্ধনের বাড়িতে বেড়াতে গেছি চেতলায়। প্রায় রোববারই যাই, চর্ব, চোষ্য, লেহ্য পেয়র নানান উপাদেয় দ্বারা হর্ষিত

হবার বাসনা হয় না কার ? সেই লালসা দমন করা যায় না, যেতে হয় তাই।

বসে আছি তাঁদের বৈঠকখানায়, গল্প করছি বসে বসে, এমন সময় এক ভদ্রলোক এসে ওঁকে বললেন—'দৌড়বাজি দেখতে চান তো আসুন আমার সঙ্গে।'

'কিসের দৌড়বাজি ?' জানতে চান হর্ষবর্ধন।

'কিসের দৌড় ? কিসের বাজি ?' সন্ধিবিচ্ছেদ করে তত্ত্বজ্ঞানে পৌঁছতে যায় গোবরা।

'আর্সোলার দৌড়।' জানান ভদ্রলোক : 'আর, তার ওপরেই বাজি ধরা হয়ে থাকে আমাদের।'

'আর্সোলারা আবার দৌড়ায় নাকি !' অবাক হন হর্ষবর্ধন।—'তারা তো ফর ফর করে ওড়ে বলেই আমরা জানি।'

'আর উড়ে উড়ে গায়ে এসে পড়ে কেবল। বলতে গেলে, ফর নাথিং !' আমি জানাই, 'ভারী ভয় করি আমি আর্সোলাদের। প্রায় পুলিসের মতই বলতে গেলে। আর্সোলাতে ছুঁলেও শুনেছি নাকি আঠারো ঘা—বাঘে ছুঁলেও তাই, আর পুলিসে ছুঁলেও তাই হয় নাকি আবার।'

'আর্সোলারা ভারী ফরফরায়। দাদার কথায় সায় দেয় গোবর্ধন—'ঠিক সফরীদের মতই প্রায়। সফরী ফয়ফরায়তে, বলে থাকে না কথায় ? সফরী মানে কি দাদা ?'

'সফরী মানে ভূপর্যটক। দেশে দেশে সফর করে বেড়ায় যারা তাদের বলে সফরী—' ব্যাখ্যা করে দেন দাদা, 'দেশ বিদেশের নানান জায়গা ঘুরে এসে তারা ফর ফর করে তার গালগপ্পো ঝাড়ে আমাদের কাছে, আর যত গুল মারে শুনিস নি ? তাকেই বলে সফরী ফরফরায়তে। তাই না শিব্রামবাবু ?'

'তাই হবে হয়ত।' জবাব দিই আমি, আমি তো কোথাও কখনো কোনো সফর করিনি, জানিনে ঠিক।'

'কেন করেন নি সফর ? এত কুণ্ডু ইস্পেশ্যাল, মুণ্ডু ইস্পেশ্যাল, ভারতদর্শন—কত কী থাকতে ?' গোব্রা শুধোয়, 'অন্ততঃ নিজের দেশটাও তো সফর করে দেখতে পারতেন।'

'মনে মনে ঘুরে বেড়াই ত্রিভুবনে।' আমি বলি : 'আমার যা কিছু সফর সব আমার সেই সোফার ওপর—আমার সোফায় শুয়ে শুয়ে। সো কার অ্যাণ্ড সো ফারদার !'

'আমাদের আর্সোলারাও কোথাও সফর করে নি।' ভদ্রলোক তাঁর নিজের কথায় ফিরে আসেন আবার। 'ফরফরও করে না কখনো। মোটেই গায়ে পড়া আর্সোলা নয় মশায় ! কারো গায় পড়তে যায় না। শিক্ষিত ভদ্র সম্ভ্রান্ত আর্সোলা সব। তারা দৌড়য় কেবল।'

'দৌড়য় তো বুঝলুম কিন্তু তাদের উপর বাজি ধরা হয় কি রকম ?' হর্ষবর্ধন জানতে চান।

'ঘোড়ার ওপর যেমনটা ধরে থাকে। ঘোড়দৌড় তা দেখেছেন, ঠিক তেমনি ধারাই।' তিনি ব্যক্ত করেন, 'আসুন না আমাদের আড্ডায়, স্বচক্ষে দেখবেন সব। এই চেতলাতেই তো আমাদের রেসকোর্স মশাই।'

'এই চেতলাতেই ? তাই নাকি ? জানতাম না তো।' হর্ষবর্ধন বলেন, 'কানেও আসে নি কখনো তো।'

'খেলাটা খুব গোপনে হয় কিনা। বাজি ধরা খেলা যে ? আমরা বিশিষ্ট লোকদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসি। কলকাতার অনেক হোমড়া-চোমড়া ব্যক্তি আমাদের এই গুপ্তসমিতির সদস্য, তা জানেন ?'

'জানলাম কিন্তু ঘোড়ার ওপর বাজি ধরার তবু একটা মানে হয়...' দাদা বলতে যান।

'তার মানে ...' বাধা দিয়ে বলে গোব্রা, 'ঘোড়ার নামও হচ্ছে আবার বাজি কি না। বাজি মানে ঘোড়া, বুঝলেন মশাই ?' মানেটা ভাই বিশদ করে দেয়।

'আবার ঘোড়ার ওপর বাজি ধরতে গিয়ে ডিগবাজি খায় অনেকে।' কথায় আমিও ওদের চাইতে কিছু কম যাই না। সেটাও আবার আরেক বাজি।'

'এক টাকায় চার টাকা—এই হচ্ছে হার।' প্রকাশ করেন ভদ্রলোক: 'ঘোড়ার রেসে যেমন মোটা টাকার বাজি ধরা হয়, এখানে ঠিক তেমনটা নয়। একের চার—এই হার।'

'বাজির খেলায় যে হার আছে তা জানা-ই। হর্ষবর্ধনের রায়: 'কিন্তু একের চার—এই হারে খেলতে রাজি হবে না সবাই। একি আবার একটা বাজি নাকি?'

'চার চার টাকা করেই ধরো না কেন দাদা, তাহলে ষোলো টাকা করে হারবে।' গোবরা বাতলায়। 'চারের চার ফেলে যাও: তাই করে চারশো খেলে যাও।'

সে হারেও দাদার তেমন চাড় দেখা যায় না। বলেন—'দূর! এ আবার কি হার রে! হেরে নাচার না হলে আবার মজা কিসের।'

উনি মজাতে গিয়ে মজতে চান, বোঝা যায় বেশ।

'না, আপনার আর্সোলার দৌড়ে বাজি ধরে সর্বাস্বান্ত হবার সুযোগ নেই আদৌ।' বলেন তিনি শেষমেষ।

'না, তা নেই।' হতাশ হয়ে পড়েন সেই ভদ্রলোক। দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বলেন অবশেষে—'না, আর্সোলারা কাউকে একেবারে ফতুর করে দেয় না। তা বটে '

'তাহলেও যাওয়া যাক দেখা যাক না খেলাটা। নিছক স্পোর্ট, নির্দোষ আমোদ যখন।' হর্ষবর্ধন বলেন শেষটা।

'নিশ্চয় নিশ্চয়।' আবার উৎসাহিত হয়ে ওঠেন সেই ভদ্রলোক। 'আপনাদের ন্যায় সম্ভ্রান্ত লোকদের জন্যই তো আমাদের এই বিশুদ্ধ প্রমোদের আয়োজন।'

হর্ষবর্ধন বলেন—'আমি কিন্তু কম হলেও একশ টাকার করে

বাজি ধরব মশাই, তার কমে আমি নেই।' বলে, একগাদা নোটের গোছা সঙ্গে নিয়ে তিনি বেরোন।

গোব্‌রার সঙ্গে আমিও তাঁর সাথী হই—টাকাকড়ি কিছু না নিয়েই। কোথায় পাবো আমি টাকা?

চললাম আর্সোলার দৌড় দেখতে। আর্সোলার এই ঘোড়দৌড় ঠিক সোনার পাথরবাটির মতই অদ্ভুত মনে হয় আমার কাছে। কৈশোরকালে মার্কটোয়েনের জাম্পিং ফ্রগ্‌স গল্পে ব্যাঙের লম্ফঝম্পের কীর্তিকাহিনী পড়েছিলাম, মিসিসিপির লোকেরা সেকালে ব্যাংকের থেকে টাকা তোলার মতন ব্যাং-কেই খেলিয়ে টাকা তুলত। দৌড় ঝাঁপের ব্যাপারে সামান্য ব্যাঙও যদিও পাল্লা দিয়ে ঘোড়াকে ব্যঙ্গ করতে পারে তো আর্সোলারাই বা কম যাবে কেন?

তবুও যেন খটকাটা থেকেই যায়। যেতে যেতেই না শুধিয়ে পারিনে—'আচ্ছা মশাই, একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না কিছুতেই। পাখা থাকতেও আর্সোলা যেমন পাখির মধ্যে গণ্য নয়, তেমনি চারটে পা আছে বলেই কি তারা আপনার ঘোড়ার সমকক্ষ হবে? মানে, আর্সোলার এই ঘোড়দৌড়ের ব্যাপারটা আমার তেমন··'

'আর ছুঁচুটো করে শুঁড় থাকলেও তাদের কিছু হাতী বলে ধরতে পারি নে।' মাঝখান থেকে ফোড়ন কাটে গোব্‌রা: 'শুঁড় আছে বলেই কি তারা ভারোত্তোলনে হাতীর মত এক হাত দেখাতে পারে?'

'গেলেই সব দেখতে পাবেন বুঝতে পারবেন। সমস্ত ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যাবে আপনাদের চোখের ওপরেই। অবিকল একেবারে ঘোড়দৌড়ের মতই মশাই, দেখবেন আপনারা।'

দেখলামও।

দেখতে দেখতে চেতলার একটু নির্জন এলাকায় এক পোড়ো বাড়ির সামনে এসে পড়লাম আমরা।

বাইরে থেকে দেখে যাকে জনমানবর্জিত ভূতুড়ে বাড়ি বলে মনে হয় তার ভেতরে ঢুকে দেখি এক ইলাহী কারখানা! আজব আজগুবি কাণ্ড সব!

বাড়িটার মাঝারি সাইজের একটা হলঘরের মোজাইক করা মেজেয় মাঝখানে কয়েকবর্গ-ফুট জায়গা ঘেরাও করে তার মধ্যে প্লাইউড কাঠের সারি সারি লম্বা বেড়া বানানো হয়েছে— বেড়াগুলোর খাড়াই ছ' ইঞ্চি করে হবে। বাঁধাকপির মত সবুজ আর গ্রীন রঙের সেই বেড়াগুলো পাশাপাশি চলে গেছে ওদিকপানে। প্রায় ফুট চারেক এগিয়ে অপর দিকের দেয়াল ঘেঁষে গিয়ে ঠেকেছে। একটা আলমারির গায়ে গিয়ে শেষ হয়েছে তারা।

'এই হচ্ছে আমাদের রেসকোর্স!' গাইডটি বাতলান।

'এই রেসকোর্স?' তাজ্জব হই আমরা।

'হ্যাঁ, তেমনি আমাদের রেসের ঘোড়াগুলিও কেমন ছোটখাটো তাও তো দেখতে হবে। ঘোড়াদেরও দেখুন একবার।'

ঘোড়াদেরও দেখা গেল। ইঁদুর ধরা বাক্সের ন্যায় খুপরির ভেতর ট্রেইনড আর্সোলারা তাদের ট্রেনারের হাতে চুপটি করে অপেক্ষমান দেখলাম।

'এখান থেকে শুরু হয়ে রেসকোর্সটা ঐ আলমারিটার কাছাকাছি গিয়ে শেষ হয়েছে—ওইটেই উইনিং পোস্ট, বুঝলেন? আর গোটা রেসট্র্যাকটা পাশাপাশি বেড়া দিয়ে ঘেরা কেন, তার মানে বুঝতে পারছেন? একেকটা আর্সোলা তার নিজের বেড়ার ভেতর দিয়ে দৌড়বে, যেন এ ওর গায়ে পড়ে মাঝপথে না ঝটাপটি বাধিয়ে দেয়—সেইজন্যেই এই ব্যবস্থা।'

'বুঝতে পারছি।'

'আর ট্রেনারদের হাতের খুপরির ভেতরে দেখছেন তো, চার পাঁচটা করে আর্সোলা রয়েছে? খুব উচ্চশিক্ষিত ওরা। পাঁচ বাজি রেস হবে, প্রত্যেক রেসের গোড়ায় ঐ খুপরির মুখ খুলে এক একটা

আর্সোলাকে এক একটা বেড়ার সম্মুখে এনে ছেড়ে দেওয়া হবে। মোটমাট পাঁচ ছটা। খুপরিতে পাঁচ ছ-জন করে ছুটবে এক এক রেসে।'

'পাঁচটার সময় শুরু—আধ ঘণ্টা বাদ বাদ খেলা হবে, খেলা টেলা মায় পেমেণ্ট সব রাত আটটার মধ্যে খতম।' গাইড প্রভু জানাল।

'তা তো বুঝলাম।' আমি বলি—'কিন্তু ওদের দৌড় করানোই তো এক শক্ত ব্যাপার মনে হচ্ছে।'

'মোটেই শক্ত নয়। বললাম না, উচ্চশিক্ষিত? এর আগে অনেক বাজি খেলেছে, বিস্তর বিস্তর বাজি জিতেছে ওরা, তা জানেন?' তিনি জানান—'তাছাড়া ঐ যে দেখছেন, স্টার্টের মাথায় এখানে একটা আর্ক লাইট ঝুলছে, আরেকটা এইরকম ঐ উইনিং পোস্টের কাছে আলমারিটার মাথায়—দেখছেন তো। আর্সোলারা আলো ভারী অপছন্দ করে জানেন বোধ হয়। যখন এ মুড়োয় আর্সোলাদের ছাড়া হবে তখন ও-মাথার আলোটা নিবিয়ে দেয়া হবে তক্ষুনি। স্বভাবতই আর্সোলারা অন্ধকার দিকটায় যেতে চাইবে তখন। যেতে যেতে কেউ এগিয়ে কেউ পিছিয়ে পড়বেই। যেটা সবার আগে ঐ আলমারির তলায় গিয়ে সেঁধুবে তার ওপর যে বাজি ধরেছে, তারই হবে জিত। মোটামুটি খেলাটা এই আর কি।'

'তা আপনাদের এই খেলা শুরু হবে কখন?' জিজ্ঞেস করলেন হর্ষবর্ধন।

'এই হোলো বলে।' জানালেন ভদ্রলোক, 'পাঁচটা বাজলেই শুরু। পাঁচটা তো প্রায় বাজে।'

ইতিমধ্যে ট্রেনাররা তাদের নিজের নিজের খুপরি হতে একেকটা বেড়ার মুখে তৈরি হয়ে বসে গেছে—ঘুলঘুলি খুলে আপন আপন আর্সোলা ছাড়ার অপেক্ষায়। যাঁরা বাজি ধরবার, তাঁরাও মেজেয় ইতস্ততঃ নিজের নিজের টাকা ধরে নিয়েছেন।

আমরা রুদ্ধ নিশ্বাসে দাঁড়িয়ে।

ছাড়া হোলো আর্সোলাদের। একেক জনের খুপরির থেকে এক এক গেটে এক এক জনা।

ছাড়া পেয়েও দু'ধারের প্রচণ্ড আলোয় থতমত খেয়ে খাড়া হয়ে রইল তারা। একদম নট নড়ন চড়ন।

'ওধারের আলোটা না নিবলে নড়বে না। ওইটেই হল ষ্টার্ট। ট্রেইনড আর্সোলা তো। এসব ইঙ্গিত বুঝতে পারে বেশ।'

হর্ষবর্ধন একশ টাকার একখানা নোট বার করে বললেন—'এদের ভেতর হট ফেভারিট কে? তার ওপরেই বাজি ধরতে চাই আমি।'

ট্রেনাররা সব একবাক্যে বলে উঠল—'সব্বাই।'

গাইড বললেন—'এদের সবাই একবার না একবার কোনো না কোনো বাজি জিতেছে। এদের জেতা কাপ, মেডেল সব দেখছেন না? সামনেই ঐ আলমারিটার মধ্যে সাজানো? সবাই এদের ফেভারিট। একের চার দল এদের সব্বারই।

'তাহলে এবারের বাজিতে আমি খেলব না। খেলাটা দেখি আগে। আর্সোলাদের গতিবিধিটা দেখা যাক।' বলে তিনি নোটখানা পকেটে পুরলেন আবার।

ওধারের আর্কলাইট নিবল। শুরু হয়ে গেল এক নম্বর রেস। এই রেসটা হচ্ছে, জানলাম, সেইসব আর্সোলার যাদের বয়স বারো মাসের বেশি নয় আর যারা একবারও কোনো খেলায় জিততে পারে নি এর পরে, পরের পর ভেটার্নদের রেস হবে পরম্পরায়। জানা গেল ভদ্রলোকের কথায়। 'তখনই আমার এই একশ টাকার ভেট দেব তাদের কাউকে।' বললেন হর্ষবর্ধন।

সেই ভেটার্নদের একজনকেই দেবেন বুঝি? সায় দিলাম আমি তাঁর কথায়।

সুড় সুড় করে এগিয়ে চলেছে আর্সোলারা—শুঁড় নেড়ে নেড়ে।

এমন সময়ে বাইরে হঠাৎ যেন হুইস্‌ল বেজে উঠল। ভেতরের কে একজন চেঁচিয়ে উঠল পুলিশ পুলিশ!

সোরগোল পড়ে গেল তক্ষুণি।

মুহূর্তের মধ্যে এসে পড়ল পুলিশ। হোমরা-চোমড়া পুলিসের কর্তা ব্যক্তিরা, তাদের সঙ্গে সাঙ্গোপাঙ্গো সার্জেন্ট, পাহারোলা, হ্যাণ্ডকাপ, বেটন এবং আরো কতো কি!

'অনেকদিন থেকেই খবরটা পাচ্ছিলাম যে এখানে লুকিয়ে লুকিয়ে জুয়া খেলা হয়।' বললেন পুলিশের বড় কর্তা, ডেপুটি-কমিশনার-টমিশনার হবেন কেউ হয়ত, 'শুধু কেবল তাক খুঁজছিলাম পাকড়াবার। হাতেনাতে আজ ধরতে পেয়েছি সবাইকে।... এই, সার্জেন্ট! মেজেয় ছড়ানো টাকাকড়ি সব কুড়িয়ে নাও। হেফাজতে রাখো। আর পাকড়াও এদের সবাইকে।'

সার্জেন্ট, পাহারোলারা সব চার ধার থেকে ঘিরে ফেলল আমাদের।

'এ সবের মুরুব্বি কে?' জানতে চাইলেন পুলিশ অফিসার।

'আজ্ঞে মুরুব্বি টুরুব্বি জানি না:' এগিয়ে এসে জবাব দিলেন এক বয়স্ক ব্যক্তি, তবে এই খালি বাড়িটা আমারই বটে। খেলাধুলার জন্যে এঁরা লীজ নিয়েছেন আমার কাছ থেকে।'

খেলাধুলা! এর নাম খেলাধুলা!' খাপপা হয়ে ওঠেন অফিসার: 'জুয়া খেলা হল গিয়ে খেলাধুলা? এর জন্যে লাইসেন্স নিতে হয়, জানেন না? এর কোন লাইসেন্স আছে কি আপনাদের?'

'জুয়াখেলা যে লাইসেন্সসাসদের খেলা, তা কে না জানে বলুন!' এতক্ষণে একটা টিপ্পনি কাটে গোবর্ধন।

মুরুব্বির মুখে কিন্তু কানো জবাব নেই। এই ফাঁকে সেই আমন্ত্রণকারী ভদ্রলোক পাহারোলাদের আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে সেই আলমারিটার পেছনে অন্তর্হিত হয়েছে আমি লক্ষ্য করলাম।

'চুরি করে জুয়া খেলাটা যে বেআইনি, জানেন না তা?... আপনি কে?' দলের মধ্যে সবচেয়ে ভারিক্কী দেখে কর্তাটি হর্ষবর্ধনকেই পাকড়েছেন এবার।

'আজ্ঞে, আমরা এই জুয়াচুরির মধ্যে নেই। খেলা দেখবার নাম করে আমাদের তিনজনকে এখানে ডেকে এনেছেন এক ভদ্রলোক। তাকে এখন দেখতে পাচ্ছিনে, কিন্তু মশাই, হলপ করে বলছি, জুয়া-টুয়া খেলি নি আমরা। খেলা দূরে থাক, খেলাটা ভালো করে দেখাই হয় নি এখনো। মোটেই খেলুড়ে নই, রেসের মাঠের নগণ্য দর্শক আমরা—আপনি বিশ্বাস করুন '

এবার গোবর্ধনের প্রতি তাঁর হুমকি : 'তুমি কে?'

'আমি কেউ না, আজ্ঞে।'

'আপনি?' এবার আমার প্রতি প্রশ্নবাণ।

'সামান্য এক লেখকমাত্র। লেখকেরা সাধারণতঃ খুব দরিদ্র হয়, জানেন নিশ্চয়? মানে, যারা হয়—আমি তাদেরই একজন। টাকাই নেই আমার তো খেলব কি। দোহাই আপনার, দয়া করে ছেড়ে দিন আমায়...।' বলে আমি যে লেখক তার প্রমাণ দেবার জন্য নমুনাস্বরূপ একটা ছড়া মুখে মুখে বানিয়ে আউড়ে দিই তাঁর মুখের ওপর—

'এই দিকে নাকে খৎ,
এই করি দণ্ডবৎ!
আর কভু আমি, প্রভু,
মাড়াব না এই পথ।'

কিন্তু এমন ছড়ার ছর্‌রা ছুঁড়েও ছাড়পত্র মিলল না। তিনি বললেন—'থানায় তো চলুন এখন। ছাড়াছাড়ির কথা পরে।'

সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পাহারোলাদের প্রতি হুঙ্কার দিয়ে উঠেছেন—'পাকড়াও শালা লোগকো। আউর আর্সোলা লোগকো।'

'হাঁ, আর্সোলা লোগকো-ভি নেহি ছোড় না।' কর্তার কথায় ভিটো দিলেন আরেক অফিসার।'

আমাকে নিরীহ দেখে একটা পাহারোলা সবার আগে পাকড়াতে এলো আমাকেই। আমি বাধা দিয়ে বললাম—'আরে, হামকো নেহি! আর্সোলালোগকো পাকড়ানে বোলতা না সাব ?'

'কাঁহা হ্যায় আউর শালা লোগ ?'

'ওই তো সামনেমে জমিনপর। ভাগতা হ্যায়, দেখতা নেহি ? ওহি আর্সোলালোক।'

বলে মেজেয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সঞ্চরমান আর্সোলাদের দেখিয়ে দিলাম।

কিন্তু আর্সোলা পাকড়ানো সহজ নয়। ধরবার চেষ্টাতেই তারা এমন ফরফর শুরু করে দিল যে পাহারোলারা নাস্তানাবুদ।

অবিশ্যি ধরাও পড়লো দু-একটা।

তাদের হাতে হাতকড়ি পড়ে কিনা আমি নজর রাখলাম। ইতিমধ্যে, যে লোকটা হামাগুড়ি দিয়ে সবার অগোচরে আলমারির আড়ালে চলে গেছল, সে করছিল কি, আলমারির তলাকার যত আর্সোলাদের ধরে ধরে একটা সিগ্রেটের টিনের ভেতর ভরছিল। অনেকগুলি ভর্তি হবার পর সে তেমনি হামাগুড়ি দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এল, এসে তেমনি করেই এক একজন অফিসারের পেছনে গিয়ে তার ট্রাউজারের তলায় এক একটা আর্সোলাকে ছেড়ে দিতে লাগল। কেবল পুলিশের কর্তা ব্যক্তিটি, পায়াভারী বলেই বোধহয় খাতির করে তঁরে ট্রাউজারের দু'টো পায়েই দু'জোড়া ছেড়েছিল সে।

তারপরে যা দৃশ্য হল তা বলবার নয়, দেখবার। এক অবর্ণনীয় নৃত্যনাট্য উদ্‌ঘাটিত হলো আমাদের চোখের ওপর।

প্যান্টের তলা দিয়ে তোমার গা বেয়ে শির শির করে আর্সোলারা উঠছে তার শিহরণ কি তুমি কোনদিন টের পেয়েছ ?

যদি পেয়ে থাকো তাহলেই বুঝতে পারবে যে সে কী রোমাঞ্চকর ব্যাপার হয়েছিল।

পুলিশের বড়কর্তা মেজকর্তা সেজকর্তা সবাই নানান্ অঙ্গভঙ্গী সহকারে নাচতে লেগেছেন তখন। সার্জেন্টরাও তথৈবচ। তাদের লাফঝাঁপ ছ্যাখে কে! আর কে তখন কাকে পাকড়ায়!
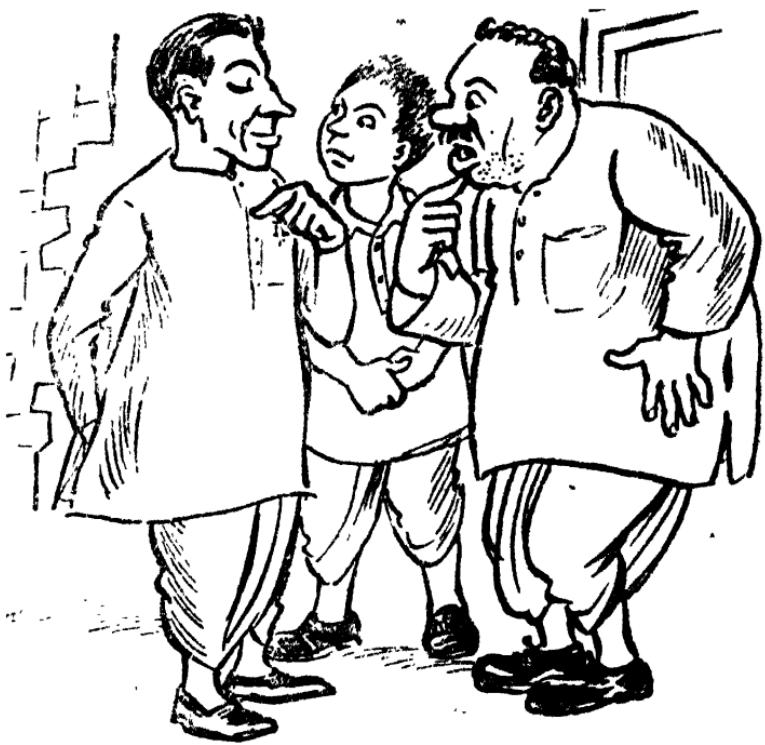
সেই ফাঁকে আমরা তিনজন তীরবেগে বেরিয়ে পড়েছি।

বাইরেও পাহারোলার ঘেরাও।

'থানা কীধর্ হ্যায় জি?' শুধোলাম তাদের একজনকে তারপর যেদিকটা তারা দেখালো তার উল্টোদিক ধরে ছুটতে লাগলাম আমরা।

দৌড়তে দৌড়তেই ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, পুলিশের লোকেরাও লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে পড়েছে তখন। তারা সবাই মিলে ছুটতে লেগেছে থানার দিকটায়—নিজেদের চোগাচাপকান খুলে ফেলে আর্সোলার কবল আর এই লম্ফ ঝম্ফের হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই মনে হয়।

আর্সোলার ঘোড়দৌড় দেখতে গিয়ে পুলিশের ঘোড়দৌড় দেখা হয়ে গেল—ফাউয়ের ওপর থাউকো!

॥ হর্ষবর্ধনের ওপর বাটপাড়ি ॥

'হায় হায়! চোরের পাল্লায় পড়ে বেঘোরে মরতে হলো শেষটায়।'

হর্ষবর্ধনকে হায় হায় করতে শোনা যায় একদিন।

'বেঘোরে পড়েছি বলতে পারো দাদা, কিন্তু মারা পড়িনি এখনো আমরা।' দাদার ভুল শোধরায় গোবরা।

'মারা পড়তে কতোক্ষণ? যা সব বিটকেল লোকদের খপ্পরে পড়া গেছে! কলকাতার থেকে কোথায় এনে ফেলেছে কন্দরে, তাইতো টের পাচ্ছিনে!

'কোন মুল্লুকে কে জানে!'

'বাইরে বেরিয়ে ঘুরে ফিরে দেখে যে একটু জানবো তারও কোনো জো নেই।'

'বাইরে বেরুলেই বা তুমি তা টের পাচ্ছো কি করে দাদা? জায়গার নাম তো আর মাটির গায় লেখা নেই।'

'মানুষের মুখে!' গোব্‌রার বিস্ময় মানে না—'মানুষের মুখে আবার মুল্লুকের নাম নাম লেখা থাকে নাকি?'

'উল্লুকের মতো কথা বলিসনে। মুখে না হলেও মুখের ভাষায় বোঝা যায় না কি?' দাদা জানায়ঃ 'লোকেরা সব বাংলা বলছে, না অসমীয়া বলছে, হিন্দি বলছে না উড়ে কথা কইছে তাই শুনেই তো বুঝতে পারবো কোথায় এসে পড়েছি! পুর্ণিয়ায় না কটকে, ছাপরায় না আরা জিলায়, গৌহাটি না গোয়ালন্দে, বোম্বাইয়ে না মাদ্রাজে······না, আর কোনো বেয়াড়া জায়গায়।'

'বোম্বাই নয় আমি হলপ করে বলতে পারি।' বলে গোব্‌রা, 'বোম্বাই কলকাতার থেকে হাজার মাইল দূরে। এরা তো আমাদের মাত্র একশো মাইল তফাতে এনেছে কেবল। আর ধরো যদি এটা মাদ্রাজই হয়····তাহলেও····'

'তাহলে ?'

'তাহলে তো তুমি ধরতেই পারবে না। সেখানকার লোকেরা সব তামিল ভাষায় কথা বলে। বুঝবে কি করে? আর তাছাড়া আরো মুশকিল'·· গোব্‌রা সমস্যাটা ক্রমশঃ প্রকট করে, সেখানে গেলে তো না খেয়েই মারা পড়তে হবে আমাদের।'

'কেন, মারা পড়বো কেন? সেখানে কি বাজার হাট নেই নাকি? দোকানপাট নেইকো সেখানে? খাবার কিনে খাবো আমরা।'

'খেতে চাইলেই বা তারা খেতে দেবে কি করে? তুমি কী চাইছো, খেতে চাইছো'ই কি না তাই বা তারা বুঝবে কি করে?

বুঝলে তো দেবে তবে। তামিল-নাদের লোক তোমার নাদ বুঝতে না পারলে—তামিল ভাষায় কথা না কইলে তোমার কোনো হুকুমই তামিল হবে না সেখানে।'

এমন সময় বাড়ির ছাতের থেকে সিঁড়ি বেয়ে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে নেমে এলেন একজন। বাঁটকুল নয়, বিটকেল নয়, ছেলে-ধরাদের কেউ না। বিলকুল ওদের অচেনা।

'কে মশাই আপনি? গুন গুন করতে করতে কোথা থেকে এলেন আবার এখানে?' হতবাক হর্ষবর্ধনের কথা ফোটে।

'মশাও অবশ্যি গুন গুন করে আর যত্রতত্র থেকে আসতে পারে বটে··' গোবরা যোগ দেয়। 'কিন্তু জলজ্যান্ত মানুষের পক্ষে আকাশ ফুঁড়ে আসা—এমন গুনপনা দেখানোটা···!'

'তাছাড়া, ছাত থেকে এলেন যে বড়ো? লোকে তো নীচের থেকেই ওপরে আসে। সদর থেকে অন্দরে····।'

'ছাতে তো আপনি থাকেন না নিশ্চয়? ছাতে তো দেখিনি আপনাকে কখনো। ছাতে উঠলেনই বা কখন? চোখে পড়েনি তো আমাদের। ছাতে তো উঠেছিলাম আমরা একবার···।' গোবরা বলে—'তখনোতো কই দেখিনি আপনাকে সেখানে?'

'থাকলে তো দেখবেন? আমি এখানকার কেউ নয় মশাই।' লোকটি জানায়: 'আমি এখানে এসেছি আপনাদের নিয়ে পালিয়ে যাবার জন্যেই···'

'অ্যাঁ! কী বললেন? আমাদের নিয়ে পালাবেন? এরাই তো আমাদের চুরি করে নিয়ে এসেছে। আমরা সম্পূর্ণ অপহৃত।'

'অপহরণের ওপর আমি অপহরণ করবো।' লোকটি বলে: 'সেই জন্যেই এসেছি আমি।'

'বুঝেছি। আপনারা অন্য এক চোরের দল।'

'না, না। চোর নই আমরা···চোর বলে গাল দেবেন না আমাদের।' সোচ্চার প্রতিবাদ তার।

'ছাঁচোর নাকি তাহলে ?'

শুনে ছ্যা ছ্যা করে লোকটা—'ছ্যা! চোর ছাঁচোরদের আমরা মানুষ বলেই ধরি না, ওটা আবার একটা পেশা নাকি? চুরি জোচ্চুরি কি ভদ্রলোকের কাজ মশাই? এমন অপবাদ দেবেন না কখনো আমাদের '

'তাহলে আপনারা ?'

'আমরা চোরের ওপর দিয়ে যাই।'

'ঠিক বুঝলাম না মশাই···'

'বুঝবেন বুঝবেন···সময় হলেই বুঝবেন! বোঝাবার সময় নেই এখন; পরে বুঝিয়ে দেবো ভালো করে। এখন, আপনারা এখান থেকে উদ্ধার হতে চান কি চান না?' জিজ্ঞেস করে লোকটাঃ 'বিটকেলদের হাত থেকে রক্ষা পেতে ইচ্ছুক কি ?'

'নিশ্চয় নিশ্চয়।' শুনে দুই ভাইয়েরই উৎসাহ হয়ঃ 'কিন্তু কি করে উদ্ধার পাবো শুনি? সদর গেটে তালা বন্ধ—দারোয়ানের কড়া পাহারা ওদিকে···'

'ওদিক দিয়ে না। ছাত দিয়ে নিয়ে পালাবো আমি আপনাদের। যেভাবে আমি এসেছি।' বলে লোকটা ছাতের সিঁড়ি ধরে—'আসুন আমার সঙ্গে তাহলে।'

হর্ষবর্ধন লোকটার পিছু পিছু ছাতে উঠে দেখেন, বাড়ির এধারকার গা-লাগা গাছটা যেমন গোবর্ধনকে একদা গর্ভে ধারণ করেছিলো পেছন দিকেও তেমনি একটা গাছ বাড়ির গা-লাগা হয়ে তাদের পৃষ্ঠপ্রদর্শন করছে নিজের। পৃষ্ঠে বহন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।

'দেখছেন তো গাছটা?' উপর-চড়াও লোকটি তাঁদের দেখায়ঃ 'গাছটা কেমন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ছাতের উপর। এই পথেই এসেছি আমি। এখন এর শাখা প্রশাখা ধরে এই গাছের ওপরে উঠতে পারবেন তো ?'

'তা আর পারবো না। বলে গাছ নিয়েই আমাদের কাজ। কাঠের কারবারী আমরা।' হর্ষবর্ধন জানান : কতো গাছকে কেটে তক্তা বানালাম। তক্তা বানিয়ে তক্তপোষ করে ফেললাম কতো গাছের। আর গোব্‌রা? ওতো ছোটেবেলার থেকে গাছের কোলে পিঠেই মানুষ। আমগাছেই বাস করতো রাতদিন হনুমানের মতো।'

'আম পাকলেই অবশ্যি।' গোব্‌রার প্রতিবাদ : দিনরাত নয়। আর সারা বছর ধরে কখনোই নয়কো।'

গাছের শাখা প্রশাখা বেয়ে উঠে নেমে শেষে মাটিতে পা দিয়ে হাঁপ ছাড়লেন হর্ষবর্ধন : 'বাঁচলাম বাবা! চোরের হাত থেকে বাঁচা গেলো এতদিনে।'

'তাতো বাঁচা গেলো।' গোব্‌রা ফিসফিসায় ; কিন্তু 'এ কার খর্পরে পড়লুম এখন কে জানে।'

পিছু পিছু নেমে এসে এগিয়ে এলো লোকটা—'আসুন সামনেই আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে। এই রাস্তার মোড়টাতেই।'

মোটরে উঠে হর্ষবর্ধনের প্রশ্ন : 'কোথায় যাচ্ছি এখন আমরা?'

'চলুন না একটু এগুলেই দেখতে পাবেন।'

মিনিট পনেরো না যেতেই একটা বড়ো শহর দেখা গেলো। গোব্‌রা শুধালো—'এটা কোন শহর মশাই?'

'শহর কলকাতা।'

'ঠাট্টা করছেন!' অবিশ্বাসের হাসি হাসলো দু'ভাই : 'কলকাতা থেকে একশো মাইল দূরে গিয়ে পড়েছিলাম আমরা। আর এই একটুখানি না আসতেই—এই টুকুনের মধ্যেই কলকাতা? কী যে বলেন আপনি!'

'বেলগেছে থেকে কলকাতা একশো মাইল—জানতুম না তো!' লোকটাও কম অবাক হয় না ওদের কথায়।

'বেলগেছে কি আমরা চিনিনে নাকি? বেলগেছেই যদি

হবে তো সেই হাসপাতাল—সেই পুলটা কই তাহলে? বেলগেছের খালটাই বা গেলো কোথায়?'

'আমরা তো বেলগেছের পথ ধরে আসিনি। বিটকেলদের নজর এড়াতে ঢাকুরের দিক দিয়ে ঢুকেছি এসে কলকাতায়!'

'কলকাতাই যদি হবে তবে চিনতে পারছি না কেন?' শুধায় গোব্‌রা: 'এই ক'দিনে এতোটাই বদলে যাবে নাকি শহর?'

'কলকাতা এই রকমই। দিনকের দিন চেহারা পালটায়। ঘণ্টায় ঘণ্টায় মিনিটে মিনিটে বদলে যায়। কলকাতাকে চেনা অতো সহজ নয় মশাই!'

দেখতে দেখতে রাসবিহারী অ্যাভিনিউ এসে পড়ে: 'হ্যাঁ হ্যাঁ কলকাতাই বটে।' উল্লসিত হয়ে ওঠেন হর্ষবর্ধন: ঐ যে টেরাম যাচ্ছে রে! টেরাম গাড়িই কলকাতার লক্ষণ—বুঝলি গোব্‌রা। রিক্সা মোটর, ঠেলাগাড়ি সবত্রই আছে—দেশ গাঁয়েও—কিন্তু এই টেরাম কলকাতার বাইরে আর কোথাও তুই পাবিনে।'

ট্রামের বড়ো রাস্তা ছেড়ে মেজ সেজ রাস্তা পার হয়ে গাড়িটা শেষে একটা ছোট গলি ধরে কোন এক পাড়ার মধ্যে এসে পড়লো।

'পাড়াটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে যেন, না দাদা?' কথা পাড়লো গোব্‌রা: 'আমাদের পাড়ার মতই ঠেকছে যেন। যেখানে আমরা থাকতাম সেই ধরণেরই অনেকটা—কী বলো তুমি?'

'তা কি করে হবে!' তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চারদিকে চারিয়ে জবাব দেন দাদা—'তবে বলতে কি, কলকাতার সব পাড়াই প্রায় এক ধাঁচের। সেই রোয়াকওয়ালাবাড়ি সব। পাশেই বস্তির যতো মাঠকোঠা. সেই ছেলেরা রবারের বল পিটছে রাস্তায়, কিম্বা ক্রিকেটের নাম করে ব্যাটম্বল খেলছে…'

'ব্যাটম্বল?' খটকা লাগে গোব্‌রার: 'কিসের অম্বল বললে?'

'ব্যাটম্বল। পেটে খেলে কী হয় জানিনা, তবে পিঠের ওপর একখানা খেলে অম্বল হয়ে যায় নির্ঘাৎ সারা শরীর টকে যায়।'

'ও, তুমি ব্যাটবলের কথা বলছো! তা অমন সংস্কৃত করে ব্যাটম্বল বললে কী বুঝবো।'

'ও বাবা! এ রাস্তাটা এমন আবড়ো খাবড়ো কেন গো?' লোকটিকে শুধান হর্ষবর্ধন।

'রাস্তার তলা দিয়ে টেলিফোনের লাইন কি কলের জলের পাইপ কিছু একটা পাতা হচ্ছে বোধ হয় সেইজন্যে খুঁড়ে তুলে ফেলেছে রাস্তা। গাড়ি এ রাস্তায় যাবে না আর। এটাকে ছেড়ে দিয়ে আমরা নেমে পড়ি এখেনেই। আসুন।'

'বলছিস আমাদের পাড়ার মতন? আমাদের পাড়াটায় কতো খোলা মেলা জায়গা ছিলো, ছেলেরা ফুটবল খেলা জমাতো সেই সব পোড়ো জমিতে, আর এখানে? কতো উঁচু উচু সব বাড়ি উঠছে—চারধারেই···চেয়ে দেখ না!'

লোকটা ওদের নিয়ে একটা খালি বাড়িতে ওঠে যায়।—'এইটেই আপাতত আপনাদের আস্তানা।' জানায় সে। কপাট নেই বাড়িটার, জানালাগুলো সব হাঁ করা, খাঁ খাঁ করছে বাড়িখানা। ধুলো-বালি ভর্তি নোংরা যত ঘর, জঞ্জালে ভরা। দেখে, শুঁকে নাক সিঁটকালো হর্ষবর্ধন—'আস্তানা, না আস্তাবল?'

'যা বলো দাদা!' বলে ওঠে গোবরা—'তা, আস্তাবলেই বা তোমার আপত্তি কি! তোমার নামের অর্ধেক তো হর্ষ (সহর্ষে সে জানায়) আর হর্স মানে ঘোড়া! যে ঘোড়া ঘাস খায়। সেই হিসেবে তোমার পক্ষে আস্তাবলই তো ভালো!'

এমন অবস্থায় ভায়ের রসিকতার প্রয়াসে দাদার পিত্তি জ্বলে যায়। গোবরার কথার কোনো জবাব না দিয়ে লোকটাকেই তিনি বলেন—'তবে আমার বাকি অর্ধেকের জন্যে একটা গোয়ালঘর দেখুন না হয়?'

'গোয়ালঘর?'

'আস্তাবলেই আমার চলে যাবে বেশ, কিন্তু ওর তো এখানে পোষাবে না। ওর জন্যই বলছিলাম।'

'আপনার ভায়ের জন্য গোয়ালঘর দেখতে বলছেন?'

'গোব্‌রা ওর নাম। আর গোব্‌রা তো গোবরেরই অপভ্রংশ। ওরা গোয়ালঘরেই পরিত্যক্ত হয়। পড়ে থাকতেই আমরা দেখতে পাই।—মানে ঐ সব অপভ্রংশ-র কথাই বলছি।'

লোকটা কিন্তু এসব রসিকতার ধার দিয়ে যায় না, সে বলে—'তা যাই বলুন! গোয়ালঘরই হোক, আর আস্তাবলই হোক, আপাতত এখানেই আপনাদের গুম করে রাখতে হবে।'

'গুম?' কথাটা যেন বোমার মতই দুম্ করে পড়ে ওদের মাঝখানে।

'আমাদের গুম খুন করা হবে নাকি?' জানতে চায় গোব্‌রা। দুই ভাই-ই ভারী গুম হয়ে যায় তাই শুনে।

'কেন, খুন করতে যাবো কেন? খুন খারাপি করিনে আমরা। ওসব আমাদের কাজ নয়।—বলেছি না আমরা চোর ছ্যাঁচোর না…'

'কিন্তু আপনারা যে কী তাও তো বলেননি।' বলেন হর্ষবর্ধন।

'বলেছি না যে আমরা চোরের উপর দিয়ে যাই? চুরির ওপর বাটপাড়ি করি। আমরা হচ্ছি বাটপাড়।'

'বুঝলাম এতোক্ষণে।' বললেন হর্ষবর্ধন। এবং বোঝার সঙ্গে যেন একমণী একটা বোঝা নেমে গেল ঘাড় থেকে—যদিও বাটপাড়ের দরুণ…বাটখারা একখানা চাপলো সেইখানে।

'আর এ জায়গাটাই বুঝি তাহলে আপনাদের সেই বাটপাড়া?'

'বাটপাড়াও নয়, ভাটপাড়াও নয়! এমনকি আপনার গোঁদলপাড়াও না…' বেশ ভনিতা করেই জায়গাটার বুঝি পরিচয় দিতে যাচ্ছিলো সে, এমন সময়ে বাধা পড়ে গোব্‌রার এক চিৎকারে—'ওমা!……'

দেয়ালের দিকে আঙুল দেখিয়ে সে চেঁচিয়ে ওঠে হঠাৎ—'ও দাদা! এটা যে আমাদের পাড়াই বটে! এতো আমাদেরই সেই বাড়ি গো! দেখছো না দেয়ালের গায়ে তোমার হাতের দেবাক্ষর....?'

হর্ষবর্ধন তাকিয়ে দেখেন সত্যিই তো! দেয়ালে তাঁর শ্রীহস্তের লাঞ্ছনা! পেন্সিল দিয়ে তাঁর হাতের স্বাক্ষর উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে—শ্রীশ্রীহর্ষবর্ধন।

আর তার ঠিক নিচেই গোবরারও এক হাত দেখানো—শ্রীমান গোবর্ধন। তাও জ্বল জ্বল করছে সামনে।

'আমাদের বাড়িই বটে তো! কিন্তু বাড়ির একি দশা!' বলতে গিয়ে প্রায় ডুকরে ওঠেন হর্ষবর্ধন—'আমাদের আসবাবপত্র, খাট, পালঙ্ক, আলমারি, দেরাজ, তক্তপোষ, তোরঙ্গ, পাপোষ, বিছানা, সোফাসেট, চেয়ার, টেবিল—এসব গেলো কোথায়?'

'কোথায় গেলো ফ্রিজ, ফ্যান, আলোর ফিটিংস, জানলা দরজা, খড়খড়ির পাল্লারা...!' গোবরার অনুযোগ।

'চুরি গেছে সব।' পরিষ্কার করে দেয় বাটপাড়: 'কলকাতার বাড়ি খালি পেলে, মালিক না থাকলে, পাহারা দেবার কেউ না রইলে বাড়ির কিছু কি থাকে নাকি? যে পায় নিয়ে পালায়। বাড়ির মালিক বাড়িতে থাকলেই রাখা যায় না। আর আপনারা তো বেশ কিছুদিন ধরেই বেপাত্তা।'

'তাই বলে এই কলকাতা শহরের বুকের ওপরে বসে এতোটাই বাড়াবাড়ি হবে নাকি?'

'মশাই, বাড়িটা যে ফিরে এসে দেখতে পেয়েছেন এটাই আপনাদের ভাগ্যি বলে ভাবুন। এখন তো শুধু আসবাবপত্তর আর দরজা জানলাই গেছে, আর দিনকতক দেরি করে ফিরলে বাড়িটারই পাত্তা পেতেন না, ভেঙে ফেলে এর ইট-কাঠ-কড়ি-বরগা, লরি করে সব পাচার হয়ে যেতো—পাড়ার সবার চোখের ওপরেই। তখন এসে ফাঁকা জমিটাই দেখতে পেতেন খালি। আরো কিছুদিন

দেখিতে এলে দেখতেন, কে এসে আপনার জায়গা দখল করে সাত তলা বাড়ি হাঁকড়ে বসে আছে—নতুন প্যাটার্ণের বাড়িটা দেখে চিনতেই পারতেন না তখন। আপনার এই বাড়ির কোনো চিহ্নই থাকতো না তখন আর। জানায় বাটপাড় !

'বৌদিও চলে গেছে বাপের বাড়ি। ঘরদোর সামলাবে কে ? গোব্‌রার আফসোস হয়, 'আরে, আমাদেরই সামলাবার কেউ ছিলো না। অনাথ বালক পেয়েই না ধরে নিয়ে গেছলো চোরে... সেই ছেলেধরারা।'

'তবেই বুঝুন !' বাটপাড় বুঝিয়ে দেয় আরো : 'আর ঘরের বৌ ঘরে নেই বলেই ঘরদোর এমন নোংরা ! ঝাড় পোঁছ করবে কে ? কে মুছবে ঘরদোর আসবাবপত্রর ? কথায় বলে গৃহিণী গৃহ মুছ্যতে ! বৌ-ঝি না মুছলে আর মুছবার কে আছে ?'

'ঘরদোর জাহান্নামে যাক, চোখের জলই বা কে মোছায় !' গোব্‌রা যেন দাদার কাটা ঘা-য় নুনের ছিটে লাগায়।

'চোখের জল মোছার কী হয়েছে ! আমি কি কাঁদছি নাকি তোর বৌদির জন্যে ? প্রাণ চায় তুই কাঁদ। ভুকরে ভুকরে কাঁদ না হয়। ভেউ ভেউ করে...ঘেউ ঘেউ করে, যেমন করে তোর খুশি কাঁদতে থাক্‌ !

'তা তো বুঝলাম কিন্তু এর রহস্যটা বুঝছিনে... বাটপাড় আঙুল বাড়ায় দেওয়ালের পানে—'ঐ আপনার শ্রীশ্রীহর্ষবর্ধন। ওর মানে ?'

'ওর মানে উনি।' গোব্‌রা বাতলায় ; 'ঐ তো আপনার সামনেই খাড়া। উনিই হর্ষবর্ধন আর আমি...আমি হচ্ছি....... !'

'বলাই বাহুল্য। বলে বাটপাড়—'আপনাকে আর আমিত্বের বড়াই করতে হবে না। আপনিই তার পরেরটি ! তাই না ? আমি খবর পেয়েছিলাম যে আপনারা খুব বড়োলোক, কিন্তু অ্যাতো বড়োলোক যে, তা আমার জানা ছিলো না।'

'বড়োলোকের পেলেনটা কী ?' গোব্‌রার বিরক্তিভরা প্রশ্ন।

'ঐ শ্রীশ্রী ! ওটা আমার ভারি বিশ্রী লাগছে। সামান্য মানুষের সামনে এই শ্রীশ্রী ? ও তো ঠাকুর দেবতার নামের আগেই থাকে গো। যেমন শ্রীশ্রীকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ......।"

'কেন, উনি কি ঠাকুর নন ? আমার বৌদির পতিঠাকুর কে তবে শুনি ? ঐ উনিই তো !

'সে তো সবার বৌদিরই একটি করে আছে মশাই।

'তাছাড়া উনি আমার বৌয়ের বটঠাকুরও তো বটেন। পুনশ্চ যোগ করে গোবর্ধন।

'না, মশাই না। এখনো আমি কারো বটঠাকুর টটঠাকুর নই। এখনও হইনি। বিয়েই হয়নি ওই ছোক্‌রার। তবে হ্যাঁ, ওর একটা কনে দেখবার জন্যেই আমার বৌ বাপের বাড়ি গেছে বটে। আমার শালীদের কাউকে ধরে পাক্‌ড়ে......এখন কদ্দুর কী হয় দেখা যাক !' হর্ষবর্ধন আপন প্রভায় প্রকাশিত হন।

'হলে তো খুব ভালোই হয়। বাটপাড সায় দেয় ওঁর কথায়— 'নইলে ঘরদোরের যা ছিরি হয়েছে, দু দুটো গৃহিণী না হলে এতো সব মুছবে কে ! এক জোড়াতেই কুলোয় কিনা কে জানে।

'আমার বৌদির কোনো জোড়া নেই মশাই। তুলনা হয় না। জানায় গোব্‌রা। 'বুঝলেন তো কেন এই শ্রীশ্রী ? ওঁরা ওই ঠাকুরগুষ্টির লোক বলেই—আমার বৌদি হচ্ছেন ঠাকুরাণী। বৌদি ঠাকুরাণী '

'তা, ঠাকুরগুষ্টির ঠিক না হলেও, এমন কি বটঠাকুরও যদি না বলা যায় আমায় এখনই....।' নিজের সাফাই দেন হর্ষবর্ধন এবার :

'তাহলেও চেয়ে দেখুন, আমার এই চেহারাটা কি বিশাল বটগাছের মতোই নয় কো ? আর বট অশথ এসব তো আমাদের দেশে দেবতাই মশাই ! তাদের তো পুজো করে থাকে পাড়াগাঁর লোকেরা ! করে না কি ?'

তাহলে আপনি সাক্ষাৎ বটঠাকুরই বটেন দেখছি

শ্রীশ্রীবটঠাকুর। আপনার ছিচরণে নমস্কার।' বলে হাতজোড় করেন বাটপাড়ঃ 'এবার চট করে আপনার ডালপালা বিস্তার করুন তাহলে। ডালপালার থেকে দুএকটা শুষ্ক চেকপত্র ঝাড়ুন দেখি! আপনাকে দণ্ডবৎ করে বিদায় হই।'

বাটপাড়ের নমস্কার পড়তে না পড়তেই নিচের থেকে ভারি সোরগোল উঠতে থাকে।

'ডাকাত পড়লো নাকিরে।' বলে বাটপাড় ফাঁকা জানলায় উঁকি দিয়ে তাকাতে গিয়ে দেখে, সদরে এক ছ্যাকরা গাড়ি খাড়া হয়েছে—তার মাথায় যতো রাজ্যের মালপত্তর। গাড়ির থেকে জাঁদরেল গোছের এক মহিলা নেমেছেন, দাঁড়িয়ে থেকে তিনি আঙুল বাড়িয়ে সহিস গাড়োয়ানের মারফতে মালপত্তর নামাচ্ছেন। দোরগোড়ায় সেসব স্তূপাকার।

আর সেই মহিলাটি বেজায় বচসা লাগিয়েছেন গাড়োয়ানের সঙ্গে গাড়ির ন্যায্য ভাড়া কতো হতে পারে তাই নিয়ে। তিনি যেমন কড়াক্রান্তিতে কড়া, গাড়োয়ানের গলাও তেমনই দস্তুরমতো চড়া। বিস্তর লোক দাঁড়িয়ে গেছে চারধারে। সারা মহল্লায় দারুণ হল্লা!

'ওমা! ডাকাতই তো বটে!' বলে ওঠে বাটপাড়—'নাঃ, ডাকাত পড়লে বাটপাড়রা আর সে তল্লাটে থাকে না!'

বলেই সে খিড়কির পথ দিয়ে দেয় সটান

'কি রকম ডাকাত দেখি তো!' বলে গোবরা জানলার ফাঁকে ভয়ে ভয়ে উঁকি মারতে গিয়ে সোৎসাহে লাফিয়ে ওঠে—'ওমা। বৌদি যে! বৌদি এসে পড়েছে বাপের বাড়ি থেকে। বেঁচে গেলাম এবার, আর কোনো ভয় নেই দাদা। আমাদের সব বিপদ কেটে গেল। এসে গেছে বৌদি!

'কেবল তোর বৌদির ভয়টাই রইলো যা।' গোমড়া মুখে গোবরার দিকে তাকিয়ে বললেন দাদা—'সেই ভয়েই থাকতে হবে এখন থেকে এই যা।'

॥ চোর ধরলো গোবর্ধন ॥

'নাঃ, বিজ্ঞাপনে কাজ হয় সত্যিই।'

হর্ষবর্ধন এসে ধপ করে বসলেন আমার ডেকচেয়ারে। হাঁফ ছেড়ে বললেন কথাটা।

'হাঁ, কথাটা যেমন বিজ্ঞাপনসম্মত তেমনি বিজ্ঞানসম্মতও বটে।' বিজ্ঞজনের মত তাঁর কথায় আমার সায়।

'সেদিন আপনাকে দিয়ে আনন্দবাজারে বার করার জন্যে সেই বিজ্ঞাপনটা লিখিয়ে নিয়ে গেলুম না ?……'

'হঁা, মনে আছে।' আমি বললাম: রাতের পাহারাদের জন্যে—সেই তো ?'

'আমাদের কাঠের কারখানায় রোজের বিক্রির বহুৎ টাকা পড়ে থাকে ক্যাশ বাক্সে, বাড়ি নিয়ে আসা সম্ভব হয় না। পরদিন সে টাকা সোজা গিয়ে জমা পড়ে ব্যাঙ্কে—সেই কারণে, রাত্রে টাকাটা

আগলাবার জন্যই কারখানায় থাকবার একজন সুদক্ষ লোক চেয়ে ছিলাম আমরা।...'

রাতের চার প্রহর পাহারা দেবার জন্য সুদক্ষ এক প্রহরী বেশ মনে আছে আমার।' আমি বলি। 'আমিই তো লিখে দিলাম কপিটা। তা, ফল কিছু পেয়েছেন বিজ্ঞাপনটা দিয়ে?''

'পেয়েছি বইকি ফল। হাতে হাতেই ফল। বলতে কি সেই কথাটা জানাতেই তো আপনার কাছে আসা।'

'ফল বলতে!' গোব্‌রাও এসেছিল তার দাদার সঙ্গে—রীতিমত প্রতিফল পেয়েছি বলা যায়!'

'কটা সাড়া এল?'

'আপাতত একটাই।' ওর দাদা জানান: ক্রমশঃ আরও সাড়া পাবো আশা করছি। আপাতত এই একটাই।'

'ওই একটাতেই বেশ সাড়া পড়ে গেছে মশাই।' সাড়া পাওয়া যায় গোব্‌রারও—সাড়া পড়ে গেছে সারা চেতলায়।' সে জানায়।

'দু ইঞ্চি বিজ্ঞাপনের দরুণ দুশো টাকা। তা নিক তাতে দুঃখ নেই। সেই দু' ইঞ্চির বা দাম দেয় কে?'

'দু'শো টাকার বিজ্ঞাপন দিলে অন্তত তার দু'শো গুণ লাভ তো হয়ই কারবারে—তা নইলে লোকে দেয় কেন?'

'এখানেও বেশ লাভ হয়েছে। দু'শো গুণেরও ঢের বেশী লাভ হয়েছে লোকটার।'

'প্রায় চারশো গুণ—তাই না দাদা?' হিসেব করে বলে ভাইটি: 'ষাট হাজার টাকার মত ছিল না বাক্সটায়?'

'প্রায় আশি হাজার টাকার কাছাকাছি....বিলকুল ফাঁকা।

'আশী হাজার টাকা হলে কত গুণ হয়?' গোব্‌রা আঙুল দিয়ে আকাশের গায় পারসেণ্টেজের আঁক কষতে লাগে। নিজের গুণপনা দেখায়।

আমার সামান্য বুদ্ধির আঁকশি দিয়ে ওদের হিসেবের নাগাল পাই না—'বিলকুল ফাঁক। তার মানে ?' শুধাই দাদাকে।

'মানে কাল সকালের কাগজে বিজ্ঞাপনটা বেরুলো না আমাদের ? আর কাল রাত্তিরেই কারখানায় সিঁধ কেটে চোর ঢুকে সমস্ত টাকা নিয়ে সরে পড়েছে। আজ কারখানা খুলতে গিয়ে দেখি ক্যাশবাক্স ভাঙা।'

'অ্যাঁ!' আঁতকে উঠি আমি: 'তা, খবর দিয়েছেন পুলিশে ?'

'পুলিশে খবর দিয়ে কী হবে ? আমাদেরই পাকড়ে নিয়ে টানা হ্যাচড়া করবে গিয়ে থানায়। এখন নিজেদের কারবার দেখব, না থানা পুলিশ করব ?' বলেন হর্ষবর্ধন: আর চোর যা ধরবে ওরা, তা জানা আছে আমার বিলক্ষণ।'

'আমি ধরতে পারি চোর।' বলল গোব্‌রা: 'তা দাদা আমায় ধরতেই দিচ্ছে না যে।'

'হাঁ, বললেই হোলো চোর ধরবো। ওদের কাছে ছোরা-ছুরি থাকে না ? ধরতে গেলেই ছুরি বসিয়ে দেবে ঘ্যাচাং করে! ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেবে এক কথায়। ওর মতন নাবালক একটা ছোঁড়াকে আমি ছুরির মুখে ঠেলে দেব—আপনি বলেন ?'

'কি করে বলি!' বলতে হয় আমায়: 'ওসব ছোরাছুরির ব্যাপারে আমাদের বয়স্কদের না থাকাই ভালো।'

'আমি কিন্তু অক্লেশে ধরে দিতাম। কোন ছোরাছুরির মধ্যে না গিয়েও—স্রেফ গোয়েন্দাগিরি করেই।'

'কি করে ধরতিস ?'

'ঐ মাটি ধরেই।'

'ও! মাটিতে বুঝি পায়ের ছাপ পড়েছে চোরের ?' আমি কৌতূহলী হই: 'কারখানার মাটিতে পায়ের দাগ রেখে গেছে বুঝি চোরটা।'

'দাগ না ছাই!' মুখ বিকৃত করেন হর্ষবর্ধন। 'সিগ্রেটের ছাইও

কেলে যায়নি একটুখানি। কী দিয়ে গোয়েন্দাগিরি করবি শুনি?'

'কারখানার মাটি নয়, সেই মাটি। বলে না যে, যে মাটিতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে। সেই মাটি ধরেই আমি চোরকে ধরতাম।' ফাঁস করে গোব্রা: —'বিজ্ঞাপনটা দিয়ে মাটি হয়েছে তো। ঐ মাটি দিয়েই আমার কাজ হাঁসিল করতাম আমি।'

ওর রহস্যের আমি থই পাই নে। এমন কি ওর দাদাও 'থ' হয়ে থাকেন।

'হ্যাঁ চোর ধরবে গোবরা!' বলে তিনি উথলে উঠলেন একটু পরেই। 'তাহলে তখন ধরলি না কেন? এর আগেও তো জিনিস চুরি গেসল আমাদের।'

'এর আগেও গেছে নাকি আবার?

'যায়নি? এই আমিই তো চুরি গেসলাম।' হর্ষবর্ধন প্রকাশ করেন।

'তোমার জিনিস নাকি?' প্রতিবাদ করে গোব্রা: 'বৌদির জিনিস না? তুমি কি তোমার নিজের জিনিস মশাই?'

'এই হোলো।' বলে ফোঁস করলেন দাদা: 'কেন, তুইও কি চুরি যাস নি আমার সঙ্গে? তুই তো আমার জিনিস। আমি তোর অভিভাবক না? তখন চোর ধরতে কী হয়েছিল তোর? আটকাচ্ছিল কোথায়?'

'তারপর? চুরি তো গেলেন, কিন্তু চোরের হাত থেকে উদ্ধার পেলেন কি করে? আমি জিজ্ঞেস করি।

'যেমন করে পায় মানুষ!' তিনি বলেন: চুরির ধন বাটপাড়িতে যায়, শোনেননি? তারপর চোরের হাত থেকে বাটপাড়ের হাতে গিয়ে পড়লাম আমরা।'

'বটে বটে!' আমার সকৌতুক কৌতুহল: তা শেষমেষ

উদ্ধার পেলেন তো সবাই? পেতেই হবে উদ্ধার শেষ পর্যন্ত। গোয়েন্দা কাহিনীর দস্তুর-ই ওই। তা উদ্ধারটা করল কে?'

'কে আবার? ডাকাত এসে পড়ল শেষটায়। ডাকাত আসতে দেখেই না বাটপাড়রা উধাও!'

'ডাকাত এসে পড়ল আবার এর ওপর?'

'হ্যাঁ, ওর বৌদি বাপের বাড়ি থেকে ফিরে যেই না দরজায় এসে হাঁক-ডাক সুরু করেছে তাই না শুনে উঁকি মেরে দেখেই না সেই বাটপাড়টা খিড়কির দোর দিয়ে চোঁ চা দৌড়। একেবারে লম্বা!···বৌ না তো আমার, আস্ত এক ডাকাত।'

'আমার ডাকসাইটে বৌদির নামে যা-তা বোলো না, বলে দিচ্ছি কিন্তু।' গোসা হয় গোবর্ধনের।

'ওই হোলো! তোর কাছে যা ডাকসাইটে আমার কাছে তাই·······।'

'যেতে দিন।' ডাকাতদের সাইডে না গিয়ে, পারিবারিক কলহের মাঝখানে পড়ে আমি মিটিয়ে দিই: 'আপনাদের চুরি যাওয়ার কাহিনীটা বলুন তো আমায়। সেবারকার আপনার যুদ্ধে যাওয়ার গল্পটা বলেছিলেন, সেটা লিখে বেশ দু পয়সা পিটেছিলাম, এবার এটার থেকেও·······'

'বলব আপনাকে এক সময়। কারখানার জন্য এখন একটা লোহার সিন্দুক কিনতে যাচ্ছি। চোর বাবাজী আবার ঘুরে ফিরে এলেও সেটা ভাঙা ততটা সহজ হবে না তার পক্ষে এবার।'

পরদিন সকালে শ্রীমান গোবর্ধন এসে হাজির। 'দেখুন—এই বিজ্ঞাপনটা দিতে যাচ্ছি আজ আনন্দবাজারে, দেখুন তো ঠিক হয়েছে কিনা?'

গোবর্ধন তার কালজয়ী সাহিত্যকীর্তিটি আমার হাতে দেয়।

বিজ্ঞাপনের কপিটিতে ওদের চেতলার বাসার ঠিকানা দিয়ে লেখা আছে দেখলাম·········'প্রাইভেট ডিটেকটিভ আবশ্যক।

আমাদের বাড়ির একটি ঘরে বহুমূল্যের তৈজস পত্র রক্ষিত আছে সেই ঘরের গা-লাগাও একটা জলের নল উঠে গেছে সোজা উপরে সেই নল বেয়ে কেউ যাতে আর উঠতে না পারে সেই দিকে সার রাত্রি নজর রাখার জন্য বিচক্ষণ একটি গোয়েন্দার দরকার। উপযুক্ত পারিশ্রমিক।' আমি বললাম: 'বিজ্ঞাপনটা দিয়ে আরেকটা এ রকম কাণ্ড বাধাবে তুমি দেখছি!'

'সে আপনি বুঝবেন না। সেসব আপনার মাথায় খ্যালে না!' বলে চলে গেল গোব্‌রা।

দিন কয়েক বাদে একটা লোক এসে ডাকল আমায়—'আসুন আমার সঙ্গে।—লোকটি বলে: ''চিনতে পারছেন না আমায়? ছদ্ম বেশে রয়েছি কিনা'—বলে লোকটা তার দাঁড়ি গোঁফ সব খুলে ফ্যালে

'গোব্‌রা ভায়া! এই অদ্ভুত বেশ কেন?

'চোর ধরতে যা চ্ছ যে। ডিটেকটিভদের ছদ্মবেশে ঘোরাফের করতে হয়—জানেন না? আপনার জন্যেও একজোড়া দাড়ি গোঁফ এনেছি, পরে নিন চট করে।...'

'আমি, আমি আবার কেন?'

'আপনাকেও ছদ্মবেশ ধারণ করতে হবে তো। আপনি আমা সাকরেদ হচ্ছেন এ-যাত্রায়:

'তুমি পরলেই হবে। আমাকে আর পরতে হবে না ছদ্মবেশ

'তাহলে আসুন চটপট। এই ফাঁকে চেতলার বাজারটা ঘু আসি একবার।' বললে সে: 'দাদাও আবার বাজার কর বেরিয়েছেন কিনা এখন। পাছে আমায় চিনতে পারেন, আমা ছদ্মবেশ ধারণের সেও একটা কারণ বটে!'

'বুঝেছি।' বলে বেরুলাম ওর সঙ্গে।

বাজারের মুদিখানাগুলোর পাশ দিয়ে যাবার সময়, হঠাৎ একট লোককে ঝাপটে ধরে চেঁচিয়ে উঠল গোব্‌রা—'ধরেছি, ধরেছি চোর পাকড়েছি ব্যাটাকে। একটা পাহারাওলা ডেকে আনুন তো এইবার।

কোনই দোষ করেনি লোকটা। মুদির সঙ্গে তেজপাতার দর কষাকষি করছিল এমন সময় গোব্‌রা ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার ওপর। এমন খারাপ লাগে আমার।

লোকটা বাবারে মারে বলে পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে আর গোব্‌রাও তাকে জড়িয়ে ধরে দাদাগো!—বৌদিগো!—বলে চেঁচায়।

কাছেই কোথাও বুঝি বাজার করছিলেন দাদা, ভায়ের হাঁক-ডাক শুনে এসে হাজির—'কী হয়েছে রে এমন ষাঁড়ের মতন চেল্লাচ্ছিস যে?'

'পাকড়েছি তোমার চোরকে। এই নাও ধরো।'

লোকটা তখন হর্ষবর্ধনের পা আঁকড়ে ধরে—'দোহাই বাবা।' আমাকে পুলিশে দেবেন না। সে দিন আমি দু'বচ্ছর খেটে বেরিয়েছি' এবার পেলে ছ বচ্ছরের জন্য ঠেলে দেবে জেলে।'

'বেশ, দেবো না পুলিশে। বের করে দাও আমাদের মালপত্তর।'

'সব বার করে দেব বাবু। চলুন।' সকৃতজ্ঞ লোকটা আমাদের সঙ্গে করে তার বস্তির কুঠুরিতে নিয়ে যায়। বার করে দেয় হর্ষবর্ধনের আশী হাজার টাকার নোটের বাণ্ডিল।

'আর আমার তৈজসপত্র? সেসব কোথায়? 'গোব্‌রার তম্বি।

'ওই যে ওই কোণায় পড়ে আছে বাবু। নিয়ে জান দয়া করে।'

ঘরের কোণে দুটো বস্তা পাশাপাশি খাড়া করা দেখলাম। এগিয়ে বস্তার ভেতরে উঁকি মেরে দেখি গিয়ে 'একি! খালি তেজপাতা দেখছি যে? এই কি তোমার……'

'তৈজসপত্র' জানায় গোবর্ধন। 'তেজপাতাকে সাধুভাষায় কী বলে তাহলে? লেখক মানুষ আপনি, অ্যাতো জানেন আর তেজপাতার ভালো বাংলা জানেন না?'

॥ গোবর্ধনের কেরামতি ॥

আসাম সরকারের নোটিশ এসেছে প্রত্যেক আসামীর কাছেই। হর্ষবর্ধনরাও বাদ যাননি। যদিও 'বহুকাল আগে দেশ ছেড়ে কলকাতায় এসে কাঠের ব্যবসায় লিপ্ত রয়েছেন তাহ'লেও আসাম সরকারের কঠোর দৃষ্টি এড়াতে পারেননি তাঁরা। সরকারী কড়া নজর পড়েছে তাঁদের ওপরেও।

শুধু হর্ষবর্ধনই নন, তাঁর ভাই গোবর্ধনও পেয়েছে এক নোটিশ। সীমান্তে যুদ্ধে যাবার নোটিশ।

পররাজ্য লিপ্সায় চীন যখন নেফার সীমানা পার হ'য়ে তেজপুরের দরজায় এসে হানা দিলো, তখন কেবল আসামবাসীদেরই নয়, প্রত্যেক তেজস্বী ভারতীয়েরই ডাক পড়েছিলো চীনকে রুখবার আর তেজপুর রাখবার জন্যে।

কলকাতায় হর্ষবর্ধনদের কাছেও এসে পৌছলো সেই ডাক। হর্ষবর্ধন কিন্তু বলেন : 'না, আমি আর যুদ্ধে যাব না।'

'সে কী দাদা! বিস্ময়ে হতবাক গোবর্ধন—'তুমি না বিলেতে গিয়ে যুদ্ধ করেছিলে। সেই যুদ্ধ যখন নিজের দেশেই এসেছে এই সুযোগ তুমি হাতছাড়া করবে—বলো কি?'

'বিলেতে গেছলাম নাকি? সে তো ইস্পেন!' বলেন হর্ষবর্ধন। —ইস্পেনেই তো লড়েছিলাম গিয়ে।'

'একই কথা। বিলেত যাবার পথেই ইস্পেন। সেখানে হিটলারের ফাসিস্ত বাহিনীকে তুমি ফাঁসিয়ে দিয়ে এসেছো। আমিও তো লড়েছিলাম তোমার পাশেই গো! আমাদের লড়ায়ের সেই কাহিনী "যুদ্ধে গেলেন হর্ষবর্ধন" বইয়ে ফাঁস করে দিয়েছে সেই হতভাগাটা।'

'কোন্ হতভাগা?'

'কে আবার, তোমার পেয়ারের সেই চকর্‌বর্‌তি! জানো না নাকি? ন্যাকা।'

'জানবো না কেন? পড়েছি তো বইটা। আমাকেও দিয়েছিলো এক কপি সে। লোকটা ভারি বাড়িয়ে লেখে কিন্তু। গাঁজা খায় বোধ হয়।'

'হ্যাঁ বড্ডো বেশী গাঁজায়।' ওর সব গল্পই গাঁজানো।'

'গঞ্জনাও বলতে পারিস—সমস্কৃত ক'রে। কিন্তু সে কথা নয়। কথা হচ্ছে এই, চিরকাল আমরাই যুদ্ধে যাবো নাকি? তখন যুবক ছিলাম লড়েছি, কিন্তু বুড়ো হ'য়ে যাইনি কি এখন? গায়ের জোর কি ক'মে যায়নি আমাদের? বন্দুক তুলতে গেলেই তা উল্‌টে পড়বো মনে হয়। তা ছাড়া প্যারেড! লম্বা লম্বা রুট মার্চ করতে পারবো আমরা এই বয়সে?'

'এই মার্চ মাসে তো নয় দাদা! এমন দারুণ গরমে।' গোবর্ধন সায় দেয়।

'তবে? এখন যারা যুবক তারা গিয়ে যুদ্ধ করুক। আমরা লড়ায়ের কথা পড়ব খবরের কাগজে। কিংবা বলবো সেই

চকর্‌বর্‌তিকে তাদের যুদ্ধের গল্প লিখতে······বইয়ে পড়া যাবে তখন।'

'তা বটে!'

'আর, সত্যি বলতে, তারাই তো লড়ছে এখন। সেই জওয়ানরাই।'

'জওয়ান! জওয়ান আবার কি দাদা?'

'রাষ্ট্রভাষা। জওয়ান মানে জোয়ান'

'মানে তুমি।' জানায় গোবর্ধন।

'আমি জোয়ান! তার মানে?' হর্ষবর্ধন হক্‌চকান।

'বৌদি বললে যে সেদিন!' প্রকাশ করে গোব্‌রা।

'তোর বৌদি বললে আমি জোয়ান? সে-ই দেখছি ফাঁসাবে আমায়। কোন মিলিটারি অফিসারের কাছে বলেছে নাকি সে?'

'না-না। সেই চকরবর্‌তিটার কাছেই বললে তো।'

'শুনি তো ব্যাপারটা। সে যদি আবার গল্পে লিখে কথাটা ছাপিয়ে দেয় তাহ'লেই তো গেছি। তারপর এই নোটিশ এসেছে!'

'বৌদির ইতুপুজা ব্রত ছিল না? পুজো-টুজো সেরে বললে আমায়, 'যাও তো ভাই, একটা বামুন ধ'রে নিয়ে এসো তো। বামুনভোজন করাতে হবে।' আমি বললাম, 'বৌদি, ইতুপুজো করলে যখন, তখন বামুন ভোজন করাতে ইতুর দাদাকেই ধরে নিয়ে আসি না-হয়।' 'ইতুর দাদাকে?' শুনে তো বৌদি অবাক! আমি বললাম, 'বৌদি, তুমি ইতুপুজো করছো জানলে আমি খোদ ইতুকেই ধ'রে আনতে পারতাম। জ্যান্ত ইতুর পুজো করতে পারতে তাহ'লে। তা যখন হ'লো না তার দাদাকেই ধ'রে আনা যাক এখন। তখন বৌদি বুঝতে পারলো কথাটা।'

'সব কিছুই একটু লেটে বোঝে সে।' হাসলেন হর্ষবর্ধন।

'গেলাম চকর্‌বর্‌তির কাছে। খাবার কথা শুনে তক্ষুনি সে এক-পায় খাড়া। কিন্তু যখন শুনলো যে ব্রত উদ্‌যাপনের বামুন

ভোজন' তখন আবার পিছিয়ে গেলো ঘাবড়ে। বললো, 'ভাই, আমি তো ঠিক বামুন নই। পৈতেই নেইকো আমার ' আমি বললাম, 'ধোপার বাড়ি কাচতে দিয়েছেন বুঝি ?' সে বললে, 'তা নয় ঠিক, কখনো পৈতে হয়েছিল কিনা মনেই পড়ে না আমার।' 'তা না হোক, আপনার আবার পৈতের দরকার কি ? বাবার পৈতে ছিলো তো ?' আমি বলি, 'বামুন না হোক, বামুনের ছেলে হলেই হবে। তখন সে এলো খেতে।'

'তা এলো না হয়।' বললেন দাদা, 'কিন্তু তার খাবার সঙ্গে আমার জোয়ান হবার কী সম্পর্ক তা তো বুঝছি না। এ তো সর্বনেশে কথা ভাই!'

'সর্বনেশে কথাই বটে। লোকটার কথাই এই রকম। পেট ঠেসে খেয়ে ঢেঁকুর তুলে বলে কি না সে—'সবই তো করলেন বৌদি, বেশ ভালই করেছেন। রেঁধেছেনও খাশা। কেবল একটা জিনিস বাদ প'ড়ে গেছে। অম্বলটা করেননি। একটু অম্বলও করতে পারতেন এই সঙ্গে।' শুনে বৌদি বলল, 'চকর্‌বরতি মশাই এ-বাজারে কী খাঁটি জিনিস মেলে নাকি ? এখন কাঁকড়মণি চালের ভাত, পচা মাছ, বাদাম তেলের রান্না, এই থেকেই যথেষ্ট অম্বল হবে, সেই ভেবেই আর অম্বলটা করিনি।' শুনে তো আঁৎকে উঠলো লোকটা—অঁ্যা, বলেন কী দিদি ? তাহ'লে তো হজম করা মুশকিল হবে দেখছি। হজম করবার কোন দাবাই আছে বাড়িতে ? দিন তাহলে একটু। এই সঙ্গে খেয়ে নিই।' 'কী রকম দাবাই ?' জানতে চাইলেন বৌদি। 'এই জোয়ান-টোয়ান।' 'এ-বাড়িতে জোয়ান বলতে তো·······' জানালো বৌদি...'জোয়ান বলতে গোব্‌রার দাদা। তা তিনি তো এখন তাঁর কারখানায় '

'তোর বৌদির যেমন কথা। আমি যদি জোয়ান তাহলে প্রৌ···· প্রৌ···প্রৌ···কথাটা কি রে ? গলায় আসছে মুখে আসছে না। মানে, প্রৌঢ় কে তাহ'লে ?

'প্রৌঢ়?'

'প্রৌঢ না কি প্রৌঢ়? ও সে একই কথা। তোর বৌদির সার্টিফিকেটে দেখছি এখন আমায় তেজপুরে গিয়ে গড়াতে হবে। বিধবা হতে হবে আমায় এই বয়সে!

'তুমি বিধবা হবে! বলো কী?' গোবর্‌রা হাঁ ক'রে থাকে।

'আমি কেন, তোর বৌদিই হবে তো, সেইতো হবে বিধবা। ও সে একই কথা। তাহলে মজাটা টের পাবে তখন। মাছ খেতে পাবে না আর। সাধের বেড়াল মাছ না পেয়ে পালিয়ে যাবে বাড়ির থেকে। বোঝ ঠ্যালা।'

'বৌদির ঠ্যালা বৌদি বুঝবে। এখন নিজেদের ঠ্যালা তো সামলাই আমরা।' বলে গোবর্‌রা।

'সামলাবার কী আছে আর।' জবাব দেন দাদা, 'বললাম না, এই ঠ্যালায় গড়াতে হবে গিয়ে তেজপুরে। মুণ্ডু একদিকে গড়াবে, ধড়টা আর একদিকে।'

'আমিও গড়াবো তোমার পাশেই দাদা।' গোবর্‌রার উৎসাহ ধরে না।

'হায়-হায়! বংশলোপ হ'য়ে গেল আমাদের।' কাতর স্বরে শুরু করেন শ্রীহর্ষ, 'একলক্ষ পুত্র তার সওয়া লক্ষ নাতি। একজনও না রহিল বংশে দিতে বাতি।' রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে গুলিয়ে রাবণের শোকে তিনি মুহ্যমান হ'য়ে থাকেন।

'মিছে হায় হায় করছো দাদা। তোমার ছেলেও নেই, নাতিও নেই—'গোবর্ধন বাৎলায়, 'তোমার আবার বংশলোপ হবে কী ক'রে?

'নাতিবৃহৎ তুইতো আছিস। তুই গেলেই আমাদের বংশ গেলো।' দাদার শোক উথলে উঠে, 'এতদিনে আমাদের বর্ধনবংশ গোল্লায় গেলো। আর বর্ধিত হতে পেলো না। গোল্লায় বল আর গোলায় বল্—একই কথা।'

'না না। তোমাকে কি ওরা ফ্র···ফ্র···ফ্র···ফ্র····

'কী ফড়ফড় করছিস।'

'ফ্রন্···' ব'লেই হতবাক্ গোবর্ধন।

'মানে?' হর্ষবর্ধন বিরক্ত হন।

'মানে তোমাকে কি ওরা আর ফ্রণ্টে পাঠাবে?' কথাটা খুঁজে পেয়েছে গোবরা, তুমি নাকি ইস্পেনের যুদ্ধে জয় ক'রে এসেছো।

প'ড়েছে নিশ্চয় তারা বইয়ে। তাই তো ডেকেছে তোমাকে। নিশ্চয় তোমাকে তারা সেনাপতিটতি ক'রে দেবে। সামনে থেকে লড়তে হবে না তোমায়। মরতে হবে না গোসায়। পেছনে থেকে পালাবার পথ পরিষ্কার পাবে।'

'পেয়েছি আর। পালাবার পথ নাই যম আছে পিছে। যুদ্ধ কাকে বলে জানিসনে তো।' বলে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়েন দাদা, 'সে বড়ো কঠিন ঠাঁই, গুরু শিষ্যে দেখা নাই।'

'দাদা-ভাইয়ে দেখা হবে কিন্তু।' গোবর্ধন আশ্বাস দেয়, তোমার কাছে কাছেই থাকবো আমি। পালাবো না।'

'জ্বালাসনে আর। এখন পড়তো, কী লিখেছে নোটিশটায়।'

'গোখেল রোডের একটা ঠিকানা দিয়েছে, নোটিশ প'ড়ে গোবরা জানায়, রিক্রুটিং আপিসের ঠিকানা। সেখানে আগামী পরশু সকাল দশটায় গিয়ে হাজির হতে হবে। নাম লেখাতে হবে। তারপর মেডিক্যাল এগজামিনেশনের পর ভর্তি করে নেবার কথা।'

'আর যদি না যাই?'

'ওয়ারেণ্ট নিয়ে এসে পাকড়ে নিয়ে যাবে পেয়াদায়।

'আর যদি পালিয়ে যাই এখান থেকে?'

'হুলিয়া বেরিয়ে যাবে। পুলিশ লেলিয়ে দেবে পেছনে।'

'পুলিশ। ওরে বাবা।' আঁতকে ওঠেন হর্ষবর্ধন, 'তাহলে আর না গিয়ে উপায় নেই। যাবো আমরা।'

যথাদিবসে যথাসময়ে যথাস্থানে গেলেন দু'ভাই। দাঁড়ালেন পাশাপাশি।

প্রথমে পরীক্ষা হ'লো হর্ষবর্ধনের।

'নাম ?,

'শ্রীহর্ষবর্ধন।'

'বয়েস ?'

'বিয়াল্লিশ।'

'পিতার নাম ?'

'পৌণ্ড্রবর্ধন। মার নাম বলবো ?'

'না। দরকার নেই। ঠিকানা ?'

'চেতলা।'

'পেশা ? মানে কী কাজ টাজ করেন ?'

'কাঠের কারবার।'

'ভারতের সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়া একটা গর্বের বস্তু, গৌরবের বস্তু ব'লে কি আপনি মনে করেন ?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

'বাহিনীর কোন বিভাগে ভর্তি হ'তে চান আপনি ?'

'আজ্ঞে ?' প্রশ্নটা ঠিক আঁচ পান না হর্ষবর্ধন।

'নানান্ বিভাগ আছে তো আমাদের ? পদাতিক বাহিনী, গোলন্দাজ বাহিনী, বিমান বাহিনী—'

আমি একেবারে জেনারেল হ'তে চাই। মানে, সেনাপতিটতি। জানান হর্ষবর্ধন।

'পাগল হয়েছেন ?' রিক্রুটিং অফিসার না-ব'লে পারেন না।

'সেটা একটা শর্ত নাকি ?' হর্ষবর্ধন জানতে চান, 'জেনারেল হ'তে হ'লে কি পাগল হ'তে হবে ?'

সে-কথার কোনো জবাব না-দিয়ে অফিসার গোবর্ধনকে নিয়ে পড়েন। '—নাম ?'

'গোবর্ধন।'

'বয়েস?'

'বত্রিশ! আর বাকি সব ঐ ঐ ঐ ঐ।'

'ঐ ঐ! তার মানে?' থই পাননা অফিসার।

'মানে, ঠিকানা, পিতার নাম, পেশা সব ঐ ঐ!' বিশদ ক'রে দেয় গোব্‌রা: 'অর্থাৎ ইংরেজি ক'রে বললে—ডিটো ডিটো ডিটো। আমরা আসলে দুই ভাই কিনা।'

'ও। তাহ'লে এবার আপনারা ঐ পাশের ঘরে চলে যান, সেখানে আপনাদের মেডিক্যাল চেক-আপ হবে।' বললেন অফিসার, 'ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ করতে পারলে তারপরে ভর্তি।'

পাশের ঘরে যাবার পথে ফিশফিশ করে গোব্‌রা, 'আর ভয় নেই দাদা! আমরা জীবনে কোনো পরীক্ষায় পাশ করতে পারিনি, আর ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ করবো! ক্ষেপেছো তুমি? ফেল যাবো নির্ঘাত—দেখে নিয়ো! বোধ হচ্ছে বেঁচে গেলাম এ-যাত্রা!'

'হ্যাঁ, ফেলছে কিনা আমাদের।' আশ্বাস পান না দাদা, 'এই যুদ্ধের বাজারে কেউ ফেলবার নয়, কিচ্ছু ফ্যালনা না।'

হর্ষবর্ধনের বিপুল ভুঁড়ি দেখেই বাতিল ক'রে দিলেন ডাক্তার—'না, এ চলবে না। প্রতিবাদ ক'রে বলতে গেছলেন বহুৎ-বহুৎ জেনারেলের ভূরি-ভূরি ভুঁড়ি তিনি দেখেছেন—যদিও ফোটোতেই তাঁর দেখা কেবল। কিন্তু তাঁর ভুঁড়িতে গোটা দুই টোকা মেরে তুড়ি দিয়ে তাকে উড়িয়ে দিলেন ডাক্তার।

তারপর গোবর্ধনের পালা এলো।

সব পরীক্ষায় পাশ করার পর চক্ষুপরীক্ষা।

'চার্টের হরফগুলো পড়তে পারছেন তো?'

'কোন চার্ট?' জিগ্যেস করলো গোব্‌রা। 'চার্ট কোথায়?'

'কেন, দেয়ালের গায়ে ওই যে চার্ট ঝুলছে।'

'অ্যাঁ! ওখানে একটা দেয়াল আছে নাকি আবার!'

'আপনার চোখ তো দেখছি তেমন সুবিধার নয়। বলে ডাক্তার একটা অ্যালুমিনিয়ামের প্রকাণ্ড ট্রে ওর চোখের দু ফুট দূরে ধ'রে রেখে শুধোলেন —'এটা কী দেখছেন বলুন তো ?'

'একটা আধুলি বোধ হয় ? নাকি, সিকিই হবে ?'

দৃষ্টিহীনতার দোষে গোবর্ধনও বাতিল হ'য়ে গেলো।

গোখেল রোডের বাইরে এসে হাঁফ ছাড়লো দু'ভাই।—'চলো দাদা। আজ একটু ফুর্তি করা যাক। আড়াইটা বাজে প্রায়। রেস্তরাঁয় কিছু খেয়ে দেয়ে চলো দুজনে মিলে তিনটের শোয়ে কোনো সিনেমা দেখিগে।'

নানান খানা খেতে-খেতে তিনটে পেরিয়ে গেলো। তিনটের পরে সিনেমায় অন্ধকার ঘরে গিয়ে ঢুকলো দু ভাই। হাতড়ে মাতড়ে ঠোক্কর খেয়ে নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসলো পাশাপাশি।

ইনটারভ্যালের আলো জ্বলে উঠতেই চমকে উঠলেন হর্ষবর্ধন। একি! গোবর্ধনের পাশেই যে সেই ডাক্তারটা ব'সে। খারাপ চোখ নিয়ে সিনেমা দেখা হচ্ছে দিব্যি—! এত কাণ্ড ক'রে শেষটায় বুঝি ধরা পড়ে গেলো গোব্‌রা।

কনুয়ের আলতো গুঁতোয় পাশের ডাক্তারকে দেখিয়ে দিলেন দাদা।

গোব্‌রা কিন্তু ঘাবড়ালো না, জিগ্যেস করলো সেই ডাক্তারকেই— 'কিছু মনে করবেন না দিদি! শুধোচ্ছি আপনাকে—এটা তেত্রিশের বাস তো ?'

'অ্যাঁ।' অতর্কিত প্রশ্নবাণে চমকে ওঠেন ডাক্তারবাবু।

'মানে, মাপ করবেন বড়দি। এটা চেতলার বাস তো ? ভিড়ের ভেতর প'ড়ে ঢুকে তো পড়লাম, কিন্তু ঠিক বাসে উঠেছি কিনা ঠেলা-ঠেলিতে বুঝতে পারছি না। চেতলায় পৌঁছবো কি না কে জানে।'

—শেষ—